বিপন্ন জাহাজের এক নাবিকের গল্প

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

ভাষান্তর-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

boirboi.blogspot.com

Scanned By Arka-The JOKER

www.boiRboi.blogspot.com

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2011.02.21 01:23:44 +06'00'

মুখবন্ধ

১৯৫৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি কলম্বিয়া নৌ-বাহিনীর একটি (ডেসট্রয়ার) জাহাজ 'ক্যালডাস' ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ে। জাহাজটি আসছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, আলাবামা রাজ্যের মবিল বন্দর-শহর থেকে। এর লক্ষ্য ছিল কলম্বিয়ার কার্টাগেনা বন্দরে ফেরা। জাহাজটি ফিরেছিল, কিন্তু আটজন নাবিক সমুদ্রে নিখোঁজ হয়। বেঁচেছিল একজন। কুড়ি বছরের এক যুবক-নাবিক। সে-ই গল্পের নায়ক।

মার্কেস ছিলেন তখন সাংবাদিক। দশ দিন ধরে দিশাহারা সমুদ্রে যুদ্ধ করে প্রাণ ফিরে পাওয়া সেই নাবিকটির সঙ্গে তিনি রোজ ছ'ঘন্টা করে কুড়ি দিন ধরে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। কিন্তু লেখাটি প্রকাশ করার সময় মার্কেসকে বিপদে পড়তে হয়। কারণ তখন কলম্বিয়ায় সামরিক বাহিনীর শাসন। সংবাদপত্রের ওপর কঠোর সেন্সরশিপের খড়্গ। তারা এই কাহিনী প্রকাশে আপত্তি জানাল। যদিও সেই নাবিককে নিয়ে দেশজুড়ে অনেক মাতামাতি হলো। তারপর যথারীতি একদিন মানুষ তাকে ভুলেও গেল। পনেরো বছর পর লেখাটি সম্পূর্ণ করলেন মার্কেস। বই করে ছাপারও সিদ্ধান্ত নিলেন।

কাহিনীর ভেতরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের মরণপণ লড়াই জীবনতৃষ্ণা আর মার্কেসের গল্প লেখার বিশেষ-কলাকৌশল সত্য-ঘটনা-নির্ভর এই গল্পের অনুবাদে আমাকে উৎসাহ জোগায়।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

৪ঠা অক্টোবর ১৯৯৪

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং 627
তারিখ 6.11.2006
ফোন 2597317
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি

www.boiRboi.blogspot.com

কেমন করে আমার জাহাজের সহকর্মীরা সমুদ্রে মারা গেল

২২শে ফেব্রুয়ারি, আমাদের বলা হলো কলম্বিয়ায় ফিরব। আট মাস ধরে আমরা আলাবামার মবিলে ছিলাম। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আর আমাদের জাহাজ কালডাসের কামান মেরামতের জন্য। স্বাধীনতা পেলে সব নাবিকরা পাড়ে নেমে যা করে, তাই করছি। মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখছি, বন্দরের 'জো পালুকা' ভাটিখানায় হুইস্কি খাচ্ছি, আর কখনো হাঙ্গামা লাগাচ্ছি।

আমার মেয়ে বন্ধুর নাম মেরি এড্রেস। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় আর একজন নাবিকের মেয়ে বন্ধু মারফত। মবিলে দু'মাস কাটানোর পর মেরি খানিকটা স্পষ্ট, স্পেনীয় বলতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, বন্ধুরা যখন ঠাট্টা করে তাকে "মারিয়া ডাইরোসিঅন" বলে সে বুঝতে পারে না। যতবারই আমি বন্দরে নামি, ওকে সিনেমায় নিয়ে যাই, যদিও ও চায় কোথাও গিয়ে আইসক্রিম খেতে। আমার আধা ইংরেজি আর ওর আধা স্পেনীয় দিয়ে আমরা শুধু কোনরকমে পরস্পরকে বুঝতে পারি। কিন্তু সিনেমা দেখতে বা আইসক্রিম খেতে আমাদের বোঝাবুঝির কোনো অসুবিধে ছিল না।

শুধু একবারই আমি মেরির সঙ্গে বেরোইনি, যে রাতে আমরা 'দ্য কেন মিউটিনি' নামে একটা ফিল্ম দেখলাম। আমার কিছু বন্ধু বলেছিল, যে মাইন সুইপার জাহাজে জীবনযাত্রা সম্পর্কে ভালো একটা ফিল্ম। এইজন্যেই দেখতে গেলাম। কিন্তু ফিল্মে সত্যি ভালো অংশটি হলো ঝড়ের, মাইন সুইপার জাহাজটি নয়। আমরা সবাই একমত হলাম, যে এই ধরনের অবস্থায় জাহাজের গতিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়াই দরকার। বিদ্রোহীরা যা করেছিল। কিন্তু আমাদের কেউই এরকম ঝড়ের মুখে পড়িনি, তাই সেই বিষয়টিই যেভাবে আমাদের প্রভাবিত করল, ফিল্মের আর কিছু তা করল না। সেই রাতে যখন জাহাজে ফিরে এলাম, একজন নাবিক, ডিয়েগো ভেলাসকোয়েস, সে-ও ফিল্মটি দেখে দারুণ প্রভাবিত হয়েছিল, আমাদের মনে করিয়ে দিল যে দু একদিনের মধ্যেই আমরা সমুদ্রে রওনা হচ্ছি। আর চিন্তিতভাবে বলল — "যদি আমাদের ঐ ধরনের কিছু হয়?"

আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে ফিল্মটা আমার ওপর বেশ ছাপ ফেলেছে। গত আট মাস সমুদ্রের অভ্যাস ভুলেছি। আমি ভীতু নই, একজন জাহাজের শিক্ষক আমাদের শিখিয়েও ছিল, জাহাজ ডুবলে কি করতে হবে। তবুও "দ্য কেন মিউটিনি" দেখার রাতে যে অস্বস্তি অনুভব করছিলাম তা স্বাভাবিক নয়।

সেই মুহূর্ত থেকেই আমি ভয়ঙ্কর পরিণাম আগাম বুঝতে পারছিলাম তা ঠিক নয়, কিন্তু কোনোবারই সমুদ্রে যাবার সময় এত সংশয় আমার ছিল না। বোগোতায় যখন আমি শিশু, বইয়ের ছবি দেখতে দেখতে আমার কখনও মনে হয়নি যে কেউ সমুদ্রে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে। বরং সমুদ্রে আমার অগাধ আস্থা। দু'বছর আগে নৌবাহিনীতে যোগ দেবার সময় থেকে আমি কখনও সমুদ্রে যেতে উদ্বিগ্ন হইনি।

কিন্তু বলতে লজ্জা নেই যে "দ্য কেন মিউটিনি" দেখার পর ভয়ের মতন কিছু আমায় পেয়ে বসল। সবচেয়ে ওপরে আমার বাঙ্কে উপুড় হয়ে শুয়ে আমার বাড়ির লোকের কথা, আর যতদিন না কারটাগেনায় পৌঁছব ততদিন এই সমুদ্রে-চলা নিয়েই ভাবতে লাগলাম। ঘুমোতে পারলাম না। হাতের ওপর মাথা গুঁজে জাহাজের মুখের দিকে জলের মৃদু ঝাপটার শব্দ, আর কুঠুরির মধ্যে ঘুমন্ত চল্লিশ জন নাবিকের শান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগলাম। আমার বাঙ্কের নিচেই প্রথম শ্রেণীর নাবিক লুই রেনগিফো বাঁশির মতো নাক ডাকছিল। আমি জানি না সে কি স্বপ্ন দেখছিল, যদি সে জানত আট দিন পরে সমুদ্রের তলায় মারা যাবে তাহলে এই গভীর ঘুম সে ঘুমোত না।

সারা সপ্তাহ ধরে আমার অস্বস্তি রয়েই গেল। যাবার দিনটা ক্রমশ ভয়ঙ্করভাবে এগিয়ে আসছে। নিজের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজব শুরু করলাম। বিশেষ করে আলোচনা করছিলাম আমাদের বাড়ির লোকদের নিয়ে, কলম্বিয়া সম্পর্কে, আর আমাদের ফিরে যাওয়া সম্পর্কে। জাহাজ ক্রমশ ভরে উঠছিল উপহারে, সব আমরা বাড়ি নিয়ে যাবো। রেডিও, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেসিন, স্টোভ। আমি একটা রেডিও কিনেছিলাম।

নিজের উদ্বেগ কাটাতে না পেরে, মনে মনে সিদ্ধান্ত করে ফেললাম যে কারটাগেনায় পৌঁছেই নৌবাহিনী ছেড়ে দেব। যাওয়ার আগের দিন রাতে মেরিকে বিদায় জানাতে গেলাম। ভাবলাম তাকে বলি আমার ভয়ের কথা আর নৌবাহিনী ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা। কিন্তু বললাম না, কারণ ওকে আমি কথা দিয়েছিলাম ফিরে আসব। সে আমাকে বিশ্বাস করত না। যদি বলেই দিই আর কোনোদিন সমুদ্রে পাড়ি দেব না। একমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর নাবিক রেমন হেরেরাকেই আমার কথা বললাম। কারণ সে-ও ঠিক করেছিল যে কারটাগেনায় পৌঁছে নৌবাহিনী ছেড়ে দেবে। আমাদের আশঙ্কা ভাগাভাগি করে নিয়ে রেমন হেরেরা আর আমি দিয়েগো ভেলাসকোয়েসকে নিয়ে হুইস্কি খেলাম, আর জো পালুকা ভাটিখানাকে বিদায় জানিয়ে দিলাম।

ভেবেছিলাম এক বোতল খাব, কিন্তু শেষ করলাম পাঁচ বোতল খেয়ে। আসলে সব মেয়ে বন্ধুরাই জানত যে আমরা চলে যাচ্ছি, তারা বিদায় জানাতে এসেছিল। মদ খেয়ে কান্নাকাটিও জুড়ল তাদের কৃতজ্ঞতা দেখাতে। বাজনার দলের নেতা, একজন গম্ভীর লোক, অবশ্য এমন একটা চশমা পরে, যাতে তাকে শিল্পী বলে মনেই হয় না, শুধু আমাদের সম্মানে এমনভাবে ম্যাম্বোস আর ট্যাঙ্গোয় বাজালো — যেন

ওগুলো কলম্বিয়ার সুর। আমাদের মেয়ে বন্ধুরা কাঁদল, আর দেড় ডলার বোতলের হুইস্কি খেতে লাগল।

যেহেতু আমরা সেই সপ্তাহে তিনবার মাইনে পেয়েছি, ঠিক করলাম ঘরের মধ্যে একটা হৈ-হল্লা লাগাব। আমার দিক থেকে ঠিক করার কারণ যে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাই মদ খেয়ে মাতাল হতে চাইছিলাম। আর রেমন হেরেরা, সে যেমন সব সময়ের মতোই খুশি খুশি থাকে আরজোনার মানুষের মতো। সে জানত কেমন করে ড্রাম বাজাতে হয়, আর অদ্ভুত প্রতিভা ছিল সব নামকরা শিল্পীদের নকল করার।

সেখান থেকে বেরিয়ে আসার একটু আগে উত্তর আমেরিকার এক নাবিক আমাদের টেবিলে এসে রেমন হেরেরার মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে নাচার অনুমতি চাইল। সে এক দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, খুব মদ খাচ্ছিল, শুধুই কাঁদছিল — অবশ্য আন্তরিকভাবেই। উত্তর আমেরিকার নাবিকটি ইংরেজিতে অনুমতি চাইল, আর রেমন হেরেরা তার হাতে হাত মিলিয়ে স্প্যানিশে উত্তর দিল — "কি বলছ বুঝছি না কুত্তার বাচ্চা।"

এর থেকেই শুরু হলো বিরাট হল্লা, মবিলে যা এর আগে কোনোদিন হয়নি। মাথায় চেয়ার ভাঙাভাঙি, রেডিও টহলদারী পুলিস, সামরিক বাহিনী। রেমন হেরেরা এর মধ্যেই বেশ কয়েকটা ঘুসি চালিয়েছিল উত্তর আমেরিকানটিকে। তারপর রাত একটায় ফিরে গেল জাহাজে। ড্যানিয়েল স্যানটোসের মতন গান গাইতে গাইতে। সে বলেছিল এই শেষ বারের মতন সে বিদেশ যাচ্ছে, এবং তাই হলো।

চব্বিশ তারিখ রাত তিনটের সময় মবিল থেকে কালডাস নোঙর তুলে চলল কারটাগেনার দিকে। বাড়ি ফিরছি বলে আমাদের সকলেই খুব খুশি। সবাই নিয়ে চলেছি কত উপহার। প্রধান গোলন্দাজের সহকর্মী মিগুয়েন ওরতেগা সবচেয়ে বেশি খুশি। আমি জানি না মিগুয়েন ওরতেগার মতন এমন দূরদর্শী আর কোনো নাবিক ছিল কিনা। মবিলের আট মাসে সে এক ডলারও ওড়ায়নি। যে টাকা সে পেয়েছে সবই খরচ করেছে কারটাগেনায় অপেক্ষা করে থাকা তার বৌয়ের জন্য উপহার কিনতে। সকালে যখন আমরা জাহাজে উঠলাম, ওরতেগা ব্রিজের ওপর তার বৌ-বাচ্চার গল্প করছিল, সেটা ঘটনাচক্র নয়, কারণ সে ও ছাড়া আর কিছু বলতও না। সে এদের জন্য নিয়েছে একটা রেফ্রিজারেটর, একটা অটোমেটিক ওয়াশার, একটা রেডিও আর একটা স্টোভ। বারো ঘন্টা পর অবশ্য ওরতেগাকে বাঙ্কে শুয়ে সমুদ্র পীড়ায় মরো মরো হতে হবে, আর চল্লিশ ঘন্টা পরে সমুদ্রের তলায় তাকে মরতে হবে।

মৃত্যুর অতিথি

যখন জাহাজ নোঙর তোলে, তখন নির্দেশ আসে — 'কর্মীরা যে যার নিজের জায়গায় দাঁড়াও'। প্রত্যেককে নিজের জায়গায় থাকতে হবে যতক্ষণ না জাহাজ বন্দর ছাড়ছে। শান্তভাবে টর্পেডোর নলের সামনে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি লক্ষ্য

করছিলাম মবিলের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশায়, আমার মেরীর কথা মনে হচ্ছিল না, সমুদ্রের কথা ভাবছিলাম। আমি জানতাম যে পরের দিন আমরা মেক্সিকো উপসাগরে পড়ব, আর বছরের এই সময় সেটা এক বিপদসঙ্কুল পথ। সকাল থেকে লেফটেন্যান্ট জেম মার্টিনেজ দিয়েগোকে দেখতে পাইনি। যিনি জাহাজের নেতৃত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি, বেশ লম্বা এবং মোটাসোটা, একজন অল্প কথার মানুষ, তাকে অল্প কয়েকবারই দেখেছি। আমি জানতাম তিনি তলিমার লোক এবং চমৎকার মানুষ। (এবং একমাত্র অফিসার যাঁকে এই বিপর্যয়ে মরতে হবে।)

সকালে আমার দেখা হলো প্রথম ওয়ারেন্ট অফিসার কারাবানতের সঙ্গে। লম্বা, সুপুরুষ চেহারা, আমার পাশ দিয়ে চলে গিয়ে মবিলের বিলীয়মান আলো দেখতে দেখতে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। মনে হয় এই শেষবারের মতন আমি তাঁকে জাহাজে দেখেছিলাম।

কালডাসের কোনো নাবিকই বোধহয় চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ও ওয়ারেন্ট অফিসার এলিয়াস সাবোগালের থেকে বাড়ি ফেরার আনন্দে বেশি সোচ্চার ছিল না। সে একেবারে সমুদ্রের নেকড়ে। বেঁটে চেহারা শক্ত, আর ভারি দারুণ কথা বলে। বয়স চল্লিশের মতন, আমার ধারণা তার বেশির ভাগ বছর কেটেছে কথা বলতে বলতে।

সাবোগালের অবশ্য যে কোনো কারো থেকে খুশি হবার কারণ আছে। কারটাগেনায় তার বউ অপেক্ষা করছে তাদের ছ'টি বাচ্চা নিয়ে। সে পাঁচ জনকে দেখেছে, শেষ জন যখন হয়েছে সে তখন মবিলে।

সকাল পর্যন্ত যাত্রা চলল নিশ্চিন্তে শান্তিতে। এক ঘন্টার মধ্যে আমিও আবার জাহাজ চলার সঙ্গে ধাতস্থ হয়ে গেলাম। পূব দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি সূর্য উঠছে। কোনো অস্বস্তি বোধ করছিলাম না, শুধু একটু ক্লান্ত। সারা রাত ঘুমোয়নি। তৃষ্ণার্ত লাগছিল, আর গত রাতের হুইস্কির অবাঞ্ছিত স্মৃতি।

ছ'টার সময় নির্দেশ এলো — "সাধারণ কর্মীদের ছুটি। জাহাজ চালানোর কর্মীরা যে যার জায়গায় দাঁড়াও।" ঘোষণা শুনতে পেয়েই আমি কুঠুরিতে ফিরে এলাম। আমার বাঙ্কের নিচে লুই রেনগিফো চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে পড়ল।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" সে জিজ্ঞাসা করল।

আমি বললাম যে সবে বন্দর ছেড়েছি। তারপর নিজের বাঙ্কে গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।

লুই রেনগিফো একেবারে পুরোদস্তুর নাবিক। তার জন্ম চোকোতে, সমুদ্র থেকে অনেক দূরে, কিন্তু তার রক্তের মধ্যে রয়েছে সমুদ্র। যখন কালডাস মেরামতির জন্য মবিলে তখন লুই রেনগিফো নাবিকদের মধ্যে ছিল না। সে ছিল ওয়াশিংটন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করত, বেশ গুরুগম্ভীর, পড়াশোনাতেও ভালো, স্পেনীয়র মতো ইংরেজিও বলতে পারত। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি পেয়েছিল ওয়াশিংটন থেকে। সেখানেই ডোমিনিকান রিপাবলিকের একটি মেয়েকে বিয়েও করেছিল ১৯৫২ সালে। কালডাসের মেরামতির কাজকর্ম শেষ হলে সে ওয়াশিংটন থেকে ফিরে

আবার নাবিক হিসেবে কাজে যোগ দিল। মবিল ছাড়ার কয়েকদিন আগে সে আমাকে বলেছিল কলম্বিয়া পৌঁছেই তার প্রথম কাজ হবে, তার বৌকে কারটাগেনায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা।

যেহেতু লুই রেনগিফো এত দীর্ঘ সময় সমুদ্র যাত্রা করেনি, আমি নিশ্চিত জানতাম ও সমুদ্র পীড়ায় ভুগবে। যাত্রার প্রথম দিন সকালে জামাকাপড় পরতে পরতে আমায় জিজ্ঞাসা করল—"তুমি এখনও অসুস্থ হওনি ?"

আমি বললাম না।

রেনগিফো বলল — "দু'তিন ঘন্টার মধ্যে দেখবো তোমার জিব বেরিয়ে আসছে।"

"ঠিক তোমার যা হবে" — আমি বললাম।

"আমি যেদিন অসুস্থ হবো" সে বলল — "সেদিন সমুদ্রও অসুস্থ হয়ে যাবে।"

বাঙ্কে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতে করতে, আমার সেই ঝড়ের কথা মনে পড়ল। সেই রাত্তিরের ভয় আবার পেয়ে বসল। দুশ্চিন্তায় আমি লুই রেনগিফোর কাছে ফিরে এলাম। সে জামাকাপড় পরছে। আমি বললাম — "এখন খুব সাবধান, তোমার জিভ যেন তোমাকে শাস্তি না দেয়।"

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

২

নেকড়ে জাহাজে আমার শেষ মুহূর্তগুলো

২৬শে ফেব্রুয়ারি, সকালের জল খাবারের জন্য যখন উঠলাম, একজন সহকর্মী বলল — "আমরা এখন উপসাগরে।" আগের দিন আমি মেক্সিকো উপসাগরের আবহাওয়া সম্পর্কে চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু আমাদের ডেস্ট্রয়ার একটু দুললেও শান্তভাবে এগোচ্ছিল, আমার ভালোই লাগছিল। ভয়ের কোনো ভিত্তি নেই। ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাড়ের সীমানা মিলিয়ে গেছে, শুধু সবুজ সমুদ্র আর ছড়ানো নীল আকাশ। এ সত্ত্বেও মিগুয়েল ওরতেগা ফ্যাকাসে রুগ্ন চেহারা নিয়ে ডেকের মাঝখানে বসে সমুদ্র-পীড়ার সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে। তার অসুস্থতা আগেই শুরু হয়েছে, মবিলের আলো তখনও দেখা যাচ্ছিল। যদিও সে নতুন নাবিক নয়, তবুও গত চব্বিশ ঘন্টা ওরতেগা দাঁড়াতেই পারেনি।

ওরতেগা কোরিয়ায় কাজ করেছে। আলমিরান্তে পাদিল্লা জাহাজে। সে অনেক জায়গায় ঘুরেছে, সমুদ্রকে চেনে ভালোভাবেই। যদিও উপসাগর শান্ত, তবুও নজরদারির কাজ হয়ে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে হচ্ছিল। সে যন্ত্রণায় কাতর, খাবার সহ্য করতে পারছিল না। নজরদারির কাজে ব্যস্ত অন্য সহকর্মীরা তাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছিল, যতক্ষণ না তার বাঙ্কে ফিরে যাবার নির্দেশ আসে। পরে সে শুয়ে পড়ে, মুখ গুঁজে মাথা একপাশে ঝুলিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে বমি করার জন্য।

মনে হচ্ছে রেমন হেরেরা ছাব্বিশ তারিখ রাতে আমাকে বলেছিল, ক্যারাবিয়ানে ঢুকলে অবস্থা খারাপ হবে। আমাদের হিসাব অনুযায়ী মাঝ রাতের পর মেক্সিকো উপসাগর ছেড়ে যাব। টর্পেডোর নলের কাছে নিজের নজরদারির জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমি বেশ আশান্বিত হয়ে কারটাগেনায় পৌঁছবার কথা ভাবছিলাম। পরিষ্কার রাত, অনেক ওপরে, তারা ভরা গোল আকাশ। নৌবাহিনীতে যোগ দেবার পর থেকে আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তারাদের চিহ্নিত করা, সেই রাতে কালডাস যখন ধীর গতিতে ক্যারাবিয়ানের দিকে চলেছে, আমি তাই করছিলাম।

আমার মনে হয় একজন বয়স্ক নাবিক যে সারা পৃথিবী ঘুরেছে, জাহাজের গতি দেখে বুঝতে পারে সে কোন্ সমুদ্রে চলেছে। যে জায়গায় আমি প্রথম জাহাজে ভেসেছি সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আমার মনে হলো ক্যারাবিয়ানে এসে গেছি। ঘড়ির দিকে তাকালাম। ২৭শে ফেব্রুয়ারির মাঝ রাত্তির, একটু পরে সকাল হবে। জাহাজ যদি বেশি না-ও দুলত, তবুও বুঝতে পারতাম ক্যারাবিয়ানে আছি। কিন্তু সব ওলট

পালট হয়ে যেতে লাগল। একটা অদ্ভুত আশঙ্কা পেয়ে বসল। কিন্তু কেন বুঝতে পারলাম না। নিচের বাঙ্কে ওরতেগার কথা মনে হলো।

সকাল ছ'টায় ডেস্ট্রয়ার ভয়ঙ্কর ওলট পালট খেতে লাগল। লুই রেনগিফো জেগেছিল আমার নিচের বাঙ্কে, শুধু বমি করেই চলেছে।

"ফাতসো" সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল — "তুমি কি এখনও অসুস্থ হওনি?"

আমি বললাম না। জানালাম যে আমি বেশ চিন্তিত। আগেই বলেছি রেনগিফো একজন ইঞ্জিনিয়ার, বেশ মেধাবী, ভালো জাহাজী — সে আমাকে বোঝাচ্ছিল কেন ক্যারাবিয়ানে কালডাসের মতো জাহাজে কিছু হতে পারে না। সে বলল — "এটা নেকড়ে জাহাজ"। আমার মনে পড়ল যুদ্ধের সময় এই ডেস্ট্রয়ারই এই এলাকাতেই একটা জার্মান ডুবো জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

"এটা নিরাপদ জাহাজ" লুই রেনগিফো আবার বলল। আমার বাঙ্কে শুয়ে জাহাজের দোলায় ঘুমোতে না পেরে ওর কথায় আশ্বস্ত বোধ করতে লাগলাম। আরো জোরে হাওয়া বইতে শুরু করল। পোর্ট হাউসের দিক থেকে। আমি কল্পনা করতে লাগলাম, মারাত্মক ঢেউ ভাঙার মুখে কালডাসের কি হতে পারে। সেই মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল "দ্য কেন মিউটিনি" ফিল্মটার কথা।

সারা দিনেই আবহাওয়া পালটালো না, আর আমাদের যাত্রাও চললো স্বাভাবিকভাবে। নজরদারির কাজ শেষ হলে, আমি চিন্তা করতে লাগলাম কারটাগেনায় পৌঁছে কি করব। প্রথমে মেরীকে চিঠি লিখব। ঠিক করলাম তাকে সপ্তাহে দু'বার লিখব, চিঠি লেখায় আমার কোনো কুঁড়েমি নেই। নৌবাহিনীতে যোগ দেবার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে বোগোতায় আমার বাড়িতে চিঠি লিখেছি। আমার প্রতিবেশী এলাকা ওনেয়াতেও বন্ধুবান্ধবদের নিয়মিত চিঠি দিয়েছি। মেরিকে চিঠি লিখব কারটাগেনায় পৌঁছে। আমি হিসাব করতে লাগলাম আর কতক্ষণ লাগবে — চব্বিশ ঘন্টা। আমার এই শেষ বার ঘড়ি দেখা।

রেমন হেরেরা মিগুয়েল ওরতেগাকে বাঙ্কে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করল। ওর অবস্থা আরো খারাপ। মবিল ছেড়ে আসার পর তিন দিন কিছুই খায়নি। কোনো রকমে কথা বলছে, একেবারে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, আর এই জল হাওয়ায় বিপর্যস্ত।

নাচ শুরু হলো

১০টার সময় নাচ শুরু হলো। কালডাস সারাদিন ধরেই দুলছিল। কিন্তু ২৭ তারিখ রাতে সেটা মারাত্মক চেহারা নিল। বাঙ্কে শুয়ে জেগে আছি, নজরদারির দায়িত্বের সহকর্মীদের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি। এও বুঝতে পারছি বাঙ্কে যারা শুয়ে তারা কেউই ঘুমোতে পারছে না। মাঝরাতের একটু আগে আমার নিচের বাঙ্কে লুই রেনগিফোকে বললাম — "তুমি এখনও অসুস্থ হওনি?"

যা ভেবেছিলাম তাই সেও ঘুমোতে পারছে না, জাহাজের দোলানি সত্ত্বেও সে

কিন্তু রসিকতা ছাড়েনি। বলল — "আমি তোমাকে বলেছিলাম যেদিন আমি অসুস্থ হবো সেদিন সমুদ্রই অসুস্থ হয়ে যাবে।" কিন্তু সেই রাতে তার কথা, সবটা শেষ করতে পারল না।

আমি আগেই বলেছি নিজের অস্বস্তির কথা। আমি ভয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। ২৭ তারিখ মাঝ রাতে বেশ বুঝছি কি আমার অবস্থা। লাউড স্পীকারে সাধারণ নির্দেশ এল — "সমস্ত কর্মীরা পোর্ট সাইডের দিকে দাঁড়াও।"

আমি বুঝলাম এই নির্দেশের মানে কি। জাহাজ বিপজ্জনকভাবে স্টার বোর্ডের দিকে কাত হয়ে পড়েছিল। সবাই পোর্ট সাইডের দিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভারে জাহাজকে সোজা করতে হবে। দু'বছর সমুদ্র যাত্রায়, আমি এই প্রথম সমুদ্রকে সত্যিই ভয় পেলাম। ডেকের ওপর প্রচণ্ড হাওয়ার শব্দ, সমস্ত নাবিকেরা জলে ভিজছে আর কাঁপছে।

নির্দেশ শোনামাত্র আমি বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে নামলাম। লুই রেনগিফো শান্তভাবে উঠে পোর্ট সাইডের দিকে একটা বাঙ্কে চলে গেল। সেটা ফাঁকা ছিল, সেই নাবিকটি তখন নজরদারির কাজে। অন্য বাঙ্কগুলো ধরে ধরে আমি হাঁটতে চেষ্টা করলাম, আর তখনই মনে পড়লো মিগুয়েল ওরতেগার কথা।

সে নড়তে পারছে না। নির্দেশ শুনে ওঠার চেষ্টা করেও বাঙ্কে পড়ে গেল। ক্লান্তি আর সমুদ্র-পীড়া তাকে অকেজো করে দিয়েছে। আমি তাকে উঠতে সাহায্য করলাম, পোর্ট সাইডের দিকে একটা বাঙ্কে নিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলাম। খুব নিচু গলায় আমাকে বলল যে সে অসুস্থ।

আমি বললাম — "দেখছি যাতে তোমাকে নজরদারিতে যেতে না হয়।"

মনে হবে এটা একটা বাজে তামাশা, কিন্তু যদি মিগুয়েল ওরতেগা বাঙ্কেই থাকত, সে বেঁচে যেত।

আঠাশ তারিখ ৪টের সময় ডাক পড়ার পর এক মিনিটও না ঘুমিয়ে আমরা ছ'জন ডেকে এসে দাঁড়ালাম। একজন হলো রেমন হেরেরা, আমার সব সময়ের সঙ্গী, নজর রাখার অফিসার গিলারমো রোজো। আমার জাহাজে এইটাই শেষ কাজ। জানতাম দুপুর দুটোয় আমরা কারটাগেনায় পৌঁছব। নজরদারির কাজে ছাড়া পেলেই ঘুমিয়ে নেব, যাতে আট মাস পর দেশের মাটিতে পৌঁছে ঘোরাঘুরি, আর সব কিছু উপভোগ করতে পারি। সাড়ে পাঁচটার সময় একজন কেবিন কর্মীর সঙ্গে ডেকের নিচটা পরীক্ষা করতে গেলাম। সাতটায় যারা সক্রিয় কাজে আটকে ছিল তাদের জলখাবারের জন্য ছাড়া হলো। আটটায় তারা ফিরে এলে আমরা ছাড়া পেলাম। এই আমার শেষ নজরদারী। অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি, যদিও হাওয়ার দাপট বাড়ছে আর ঢেউগুলোর চেহারা ক্রমশ বড়ো, আরো বড়ো হচ্ছে, জাহাজের মাস্তুলে ধাক্কা খাচ্ছে, ডেককে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

রেমন হেরেরা জাহাজের শেষ প্রান্তে, আর লুই রেনগিফো সেখানে জীবন-রক্ষক হিসেবে হেড-ফোন নিয়ে। ডেকের মাঝখানে মিগুয়েল ওরতেগা শুয়ে পড়েছে, যন্ত্রণা

আর সমুদ্র-পীড়ায়। জাহাজের এইখানটাই সবচেয়ে শান্ত। আমি সরবরাহ বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাবিক এদারদো কাস্তিলোর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম। সে বেশ সংযত, বোগোতার স্নাতক। মনে নেই ঠিক কি কথা বললাম। শুধু মনে আছে আমাদের আর দেখা হয়নি, কয়েক ঘন্টা পরে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল।

রেমন হেরেরা নিজেকে ঢেকে ঘুমোবে বলে কিছু পিচবোর্ড জোগাড় করেছিল। জাহাজের ওলট পালটে আমাদের কুঠুরিতে ঘুমনো অসম্ভব। ঢেউগুলো লম্বা হচ্ছে, দারুণ জোর, ডেক ধুয়ে যাচ্ছে। জাহাজের পেছন দিকে রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেসিন, স্টোভের মাঝখানে রেমন হেরেরা আর আমি শুয়ে আছি, খানিকটা নিরাপদে যাতে ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে চলে না যাই। আকাশের দিকে তাকালাম। খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগছিল, মনে হচ্ছিল এইভাবেই কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমরা কারটাগেনা উপসাগরে পৌঁছব। ঝড় নেই, দিনটাও বেশ পরিষ্কার, দূরের জিনিস সব দেখা যাচ্ছে, আকাশ গভীর নীল। আমার বুট জুতোও এখন কষ্ট দিচ্ছে না। নজরদারী ছেড়ে আমি একটা রবারের জুতো পরেছি।

এক মুহূর্তের নীরবতা

লুই রেনগিফো জিজ্ঞাসা করল, ক'টা বাজে। সাড়ে এগারোটা। জাহাজটা ভয়ঙ্করভাবে স্টার বোর্ডের দিকে হেলে পড়ার সময় থেকে এক ঘন্টা চলে গেছে। লাউড স্পীকারে আবার শোনা গেল গত রাতের নির্দেশ — "সমস্ত কর্মী পোর্ট সাইডের দিকে দাঁড়াও।" রেমন হেরেরা আর আমি নড়লাম না। কারণ আমরা সেই দিকেই আছি।

মিগুয়েল ওরতেগার কথা ভাবলাম। ওকে স্টার বোর্ডের দিকে দেখেছি। সমুদ্র-পীড়ার যন্ত্রণায় আমার পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে, তারপর বেঁকে পোর্ট সাইডের দিকে চলে গেল। সেই মুহূর্তেই জাহাজ মারাত্মকভাবে কাত হয়ে গেল। তাকে আর দেখা গেল না। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ। একটা বিরাট ঢেউ ভেঙে পড়ল আমাদের ওপর। পুরো ভিজে গেছি। যেন সমুদ্র থেকে উঠে এসেছি। আস্তে আস্তে জাহাজটা ডান দিকে কাত হয়ে গেল। লুই রেনগিফো একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, খুব ঘাবড়ে গিয়ে বলল — "কি কপাল, জাহাজ ডুবে যাচ্ছে, উঠতে পারছি না।"

এই প্রথম লুই রেনগিফো ভয় পেয়েছে। আমার পাশে সম্পূর্ণ ভিজে রেমন হেরেরা গভীর চিন্তামগ্ন। এক মুহূর্তের নিঃস্তব্ধতা। রেমন বলল — "যখন নির্দেশ আসছে দড়ি কেটে মাল ফেলে দেবার জন্য, আমিই প্রথম এগিয়ে হাত লাগাব।"

১১-৫০ মিনিট। ভাবছিলাম ওরা যে কোনো সময় নির্দেশ দেবে দড়ি কেটে ফেলার। যাকে বলে "ডেক হালকা করা।" নির্দেশ দিলেই রেডিও, রেফ্রিজারেটর, স্টোভ তর তর করে সমুদ্রে চলে যাবে। তখন আমাকে নিচে কুঠুরিতে ঢুকতে হবে, কারণ রেফ্রিজারেটর আর স্টোভের আড়ালেই আমরা আশ্রয় নিয়েছি। সেগুলো গেলে, ঢেউ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

জাহাজটা ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। আরো বেশি ওলট পালট খাচ্ছে। রেমন হেরেরা একটা তারপোলিন দিয়ে নিজেকে ঢাকার চেষ্টা করছে। আর একটা বিরাট ঢেউ। আগের থেকেও বড়। আমাদের ওপর ভেঙে পড়ল। একটা ক্যানভাস দিয়ে আত্মরক্ষা করছি। মাথার ওপর হাত তুলে আছি। ঢেউ চলে যাচ্ছে। আধ মিনিট পর লাউড স্পীকারের হাঁক শোনা গেল।

ওরা বোধহয় মালপত্র ফেলে দেবার নির্দেশ দেবে। কিন্তু নির্দেশ এলো অন্য রকম, শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে — "ডেকের কর্মীরা লাইফ জ্যাকেট পরে নাও।" লুই রেনগিফো শান্তভাবে এক হাতে হেড-ফোন আর এক হাতে জ্যাকেট পরে নিল। প্রথমে আমার সব কিছু শূন্য লাগছিল। এক একটা ঢেউয়ের পর নিদারুণ নিঃস্তব্ধতা। লুই রেনগিফোর দিকে তাকালাম। লাইফ জ্যাকেট পরে আছে, হেড-ফোন সরিয়ে নিয়েছে। চোখ বুজলাম.। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

প্রায় এক মিনিট ধরে সেই আওয়াজ শুনলাম। রেমন হেরেরা নড়ছে না। আমি হিসাব করলাম এখন নিশ্চয়ই বারোটা। কারটাগেনা পৌঁছতে এখনো দু'ঘন্টা। মুহূর্তের মধ্যে এ জাহাজটা শূন্যে উঠে গেল। আমি হাত তুলে ঘড়ি দেখতে গেলাম। হাতও দেখতে পেলাম না, ঘড়িও না। ঢেউটা দেখতে পাইনি। জাহাজ একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। যে মালপত্রের আড়ালে ছিলাম সেগুলোও ভেসে গেল। দাঁড়িয়ে উঠলাম, আমার গলা পর্যন্ত জল। লুই রেনগিফোকে দেখলাম বড় বড় চোখ, সবুজ শান্ত, জোর করে ভেসে থাকতে চাইছে, হেড-ফোন শূন্যে। আমি সম্পূর্ণ জলের তলায় চলে গেছি, ওপরের দিকে সাঁতরে ওঠার চেষ্টা করলাম।

এক, দুই, তিন সেকেন্ড। আমি সাঁতরে ওপরে উঠছি। জলের ওপরে উঠতে হবে। বাতাস চাই। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মালপত্র আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলাম। সেগুলো আর নেই। আমার চারপাশে আর কিছুই নেই। ভেসে উঠে সমুদ্রে আর কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখলাম একশ মিটার দূরে ঢেউয়ের মাঝখানে জাহাজটা চারদিকে সাবমেরিনের মতো জল উড়িয়ে ঢেউয়ের ঝাপটা খাচ্ছে। বুঝলাম আমি জাহাজ থেকে বাইরে পড়ে গেছি।

www.boiRboi.blogspot.com

৩
চার বন্ধুর সলিল সমাধি

প্রথমেই মনে হলো, আমি ভয়ঙ্কর একা। বিশাল সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে। ভেসে থাকার চেষ্টা করতে করতে দেখলাম, আর একটা ঢেউ ডেস্ট্রয়ারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাজটা দুশো মিটার দূরে, অতলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হলো একদম তলিয়ে গেছে। এক মুহূর্ত পরে যা ভেবেছিলাম তাই দেখতে পেলাম। যত মালপত্র মবিল থেকে ডেস্ট্রয়ারে পোরা হয়েছিল, সব ভেসে উঠছে। এক এক করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চারপাশের ঢেউয়ে ওলট পালট খাচ্ছে বাক্সবন্দী কাপড়, রেডিও, রেফ্রিজারেটার, আর সব ঘরোয়া আসবাবপত্র। আমি সেগুলো ধরেই ভাসার চেষ্টা করলাম। সবটা ধারণাই করতে পারছিলাম না কি ঘটে চলেছে। ভাসমান একটা বাক্স ধরে, হতভম্বের মতন দেখতে লাগলাম সমুদ্রের অবস্থা। দিনটা ছিল পরিষ্কার। শুধু এলোমেলো প্রবল হাওয়া, ঢেউ আর চারপাশে ছড়ানো মালপত্র ছাড়া জাহাজডুবির আর কোনো চিহ্ন নেই।

পাশেই যেন কার চিৎকার শুনলাম। প্রবল হাওয়ার শব্দেও চিনতে পারলাম লম্বা শক্ত চেহারা প্রথম ওয়ারেন্ট অফিসার জুলিও আমাডোর কারাবার্লোর কণ্ঠস্বর। সে কাউকে বলছে — "লাইফ বেল্টের নিচে আঁকড়ে ধরো।" আমি যেন এক মুহূর্তের গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। সমুদ্রে আমি শুধু একা নই। কয়েক মিটার দূরে আমার সহকর্মীরা পরস্পর ডাকাডাকি করছে, চেষ্টা করছে ভেসে থাকার। বুঝতে পারছি কোনো একটা নির্দিষ্ট দিকে সাঁতার কাটা সম্ভব নয়। কারটাগেনার থেকে এখনো আরো ৫০ মাইল দুরে। তখনও ভয় পাইনি। মনে হচ্ছিল অনির্দিষ্ট কাল এই বাক্স ধরেই থাকতে পারব — যতক্ষণ না সাহায্য পৌঁছায়। চারপাশে অন্য নাবিকদের একই দুরবস্থা দেখে আমার আস্থা ফিরে আসছিল। ঠিক তখনই দেখলাম ভাসমান লাইফ বোট।

দুটো বোট ভেসে চলেছে, সাত মিটার পাশাপাশি। ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে উঠেছে। যা আশাই করা যায় না। ওখানেই আমার সহকর্মীরা ডাকাডাকি করছে। আশ্চর্য যে কেউই সেই লাইফ বোটটা ধরতে পারছে না। হঠাৎ একটা বোট কোথায় তলিয়ে গেল। বুঝতে পারছিলাম না সাঁতার কেটে আর একটা দিকে যাবো, না বাক্সটা আঁকড়ে ধরে চুপচাপ থাকব। ঠিক করার আগেই দেখলাম যেদিকে বোটটা সেদিকে সাঁতরাচ্ছি। ওটা আমার থেকে ক্রমে দূরেই সরে যাচ্ছিল। প্রায় তিন মিনিট সাঁতার কাটলাম। এই মুহূর্তে বোট আর দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমি সতর্ক, লক্ষ্য হারাব

না। হঠাৎ একটা বিরাট ঢেউ বোটটাকে ঠেলে আমার পাশে এনে দিল। বিরাট সাদা আর একদম ফাঁকা বোট। লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম। তৃতীয় বারের চেষ্টায় পারলাম। হাঁফাতে হাঁফাতে বোটের ওপরে উঠে, হাওয়ার ধাক্কায় নড়তে পারছি না, ঠাণ্ডায় কাঁপছি। বসে থাকাই মুশকিল। দেখতে পাচ্ছি আমার তিন সহকর্মী বোটের কাছে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

www.boiRboi.blogspot.com

আমি ওদের চিনতে পারলাম। কোয়ার্টার মাস্টার এদুয়ার্দো কাস্তিলো, জুলিও আমাডোর কারাবার্লোর ঘাড় আঁকড়ে ধরে। যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন কারাবার্লো ছিল নজরদারির কাজে। জীবন-রক্ষার জ্যাকেটও পরেছিল। সে চিৎকার করছিল — "কাস্তিলো, শক্ত করে ধরো।" দশ মিটার দূরে তারা ছড়ানো মালপত্রের মাঝখানে ভাসছে।

আর এপাশে লুই রেনগিফো, কয়েক মিনিট আগেও তাকে ডেস্ট্রয়ারে দেখেছি ডান হাতে হেড-ফোনটা উঁচু করে ধরে ভাসার চেষ্টা করছিল। তার স্বভাবসুলভ শান্তভাব আর পাকা নাবিকের আত্মবিশ্বাসের জন্যই সে বলত নিজে অসুস্থ হবার আগে সমুদ্রই অসুস্থ হয়ে পড়বে। ভালোভাবে সাঁতার কাটার জন্য তার জামাও সে ছিঁড়ে ফেলেছিল, কিন্তু জীবন-রক্ষার জ্যাকেটটি হারিয়ে বসেছিল। আমি তাকে দেখতে না পেলেও যেন গলা শুনতে পাচ্ছিলাম — "এদিকে পা চালাও।"

তাড়াতাড়ি দাঁড়টা ধরলাম। ওদের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করলাম। জুলিও আমাডোরের ঘাড় ধরে আছে এদুয়ার্দো কাস্তিলো। তারা বোটের কাছাকাছি। একটু দূরে আমার চতুর্থ সহকর্মী রেমন হেরেরা। নিঃসঙ্গ আর ছোট্ট দেখাচ্ছে, হাতছানি দিচ্ছে একটা বাক্সের ওপর থেকে।

মাত্র তিন মিটার

ঠিক করা মুশকিল কোন সহকর্মীর দিকে আগে এগোবো। আরাজোনার তরুণ, মবিলের হৈ চৈ-বাজ রেমন হেরেরা কিছুক্ষণ আগেও আমার সঙ্গে জাহাজের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। ওর দিকেই জোরে এগুতে চেষ্টা করলাম। লাইফ বোটটাও দু'মিটার লম্বা। খুব কঠিন, দামাল সমুদ্র উল্টো হাওয়ায় দাঁড় বাইতে হচ্ছে। এক মিটারের বেশি এগোতেই পারিনি। আমিও মরিয়া। চারদিকে তাকিয়ে দেখি রেমন হেরেরা নেই। শুধু লুই রেনগিফো আত্মবিশ্বাস নিয়ে বোটের দিকে সাঁতরে এগিয়ে আসছে, আমি নিশ্চিত সে পারবে। আমার বাক্সের নিচে তাঁকে নাক ডাকতে শুনেছি। জানি তার অচঞ্চল মন সমুদ্রের থেকেও কঠিন।

ওদিকে জুলিও আমাডোর আপ্রাণ এগোতে চেষ্টা করে যাচ্ছে, এদুয়ার্দো কাস্তিলোকে ঘাড়ে নিয়ে, যাতে সে পড়ে না যায়। তারা মাত্র তিন মিটারেরও কম দূরে। ঠিক করলাম ওরা আর একটু কাছে এলে একটা দাঁড় এগিয়ে দেবো ধরার জন্য। তখনই এক বিশাল ঢেউ বোটটাকে ওপরে ছুঁড়ে দিল। আর সেই ঢেউয়ের মাথায় উঠে

দেখতে পেলাম ডেস্ট্রয়ারের মাস্তুল দূরে সরে যাচ্ছে। আর একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় নিচে নেমে এলাম, দেখলাম ঘাড়ে এদুয়ার্দো কাস্তিলোকে নিয়ে জুলিও আমাডোর নেই। শুধু দু'মিটার দূরে লুই রেনগিফো তখনও শান্তভাবে বোটের দিকে সাঁতরে আসছে।

একটা কাজ কেন করলাম জানি না। এগোতে পারব না জেনেও আমি দাঁড়টাকে জলে ধরে রাখলাম, বোটটাকে নড়তে দেব না, যেন নোঙর ফেলে রাখব। লুই রেনগিফো একেবারে বিধ্বস্ত। একটু থামল। হাত ওপরে তোলা, যেমন সে জাহাজে হেড-ফোন তুলে ধরেছিল। চিৎকার করে বলল — "এদিকে বেয়ে এসো।"

ওর দিক থেকেই হাওয়া আসছিল। আমি চিৎকার করে জানালাম হাওয়ার মুখে দাঁড় টানতে পারছি না, সে আর একবার চেষ্টা করল। মনে হলো শুনতে পেল না। মাল ভর্তি বাক্সগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। ঢেউয়ের ধাক্কায় লাইফ বোট এপাশ ওপাশ নাচছে। হঠাৎ লুই রেনগিফোর থেকে আমি পাঁচ মিটার মতো দূরে সরে গেলাম। ওকে দেখতে পাচ্ছি না। সে অন্য দিকে আবার ভেসে উঠল, তখনও সে ভয় পায়নি। তলিয়ে গিয়েও সাঁতার কাটছে, যাতে ঢেউ তাকে টেনে নিয়ে যেতে না পারে। আমি দাঁড়টা বাড়িয়ে দিলাম। লুই রেনগিফোর কাছাকাছি গেলে ওটা ধরতে পারবে এই আশায়। দেখলাম সে হাঁফিয়ে পড়েছে, নিঃশ্বাস ফুরিয়ে গেছে। ডুবতে ডুবতে আমায় ডাকল — "ফাত্‌সো, ফাতসো।"

আমি দাঁড় টানার চেষ্টা করছি, প্রথম বারের মতনই পারছি না। শেষবারের মতো চেষ্টা করলাম যাতে লুই রেনগিফো দাঁড়টা ধরতে পারে। তার ওপরে তোলা দুটো হাত — কিছুক্ষণ আগেও জল থেকে বাঁচতে হেড-ফোনটাকে তুলে ধরেছিল, সেই দুটো হাত একেবারেই ডুবে গেল। দাঁড় থেকে দু'মিটার মাত্র দূরে। কতক্ষণ সেইভাবে রইলাম জানি না। লাইফ বোটটাকে সামাল দিয়ে দাঁড়টাকে বাইরে রেখে জলের দিকে খুঁজতে লাগলাম। কেউ যদি ভেসে ওঠে। সমুদ্র পরিষ্কার, হাওয়ার জোর বেড়েছে। আমার জামায় হাওয়ার ঝাপটার আওয়াজ কুকুরের গোঙানির মতো। সব মালপত্র ডুবে গেছে। মাস্তুলটা আরো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যা ভেবেছিলাম তা নয়। ডেস্ট্রয়ার এখনো ডোবেনি। কেমন সব শান্ত লাগছিল। মনে হচ্ছিল কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা আমার খোঁজে আসবে। অন্য সহকর্মীদের কেউ নিশ্চয়ই আর একটা লাইফ বোটে উঠতে পেরেছে।

অন্যদের না উঠতে পারার কারণ নেই। বোটগুলোতে খাবার দাবার জমা নেই, আসলে ডেস্ট্রয়ারের কোনো লাইফ বোটেরই যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক নেই। একটা দাঁড় টানা বোট আর হোয়েলার ছাড়াও সবশুদ্ধ ছ'টা এই রকম বোট আছে। নিশ্চয়ই আমাদের কেউ না কেউ অন্য লাইফ বোটে উঠেছে, যেমন আমি উঠেছি। ডেস্ট্রয়ার সম্ভবত সবাইকেই খুঁজছে।

কিছুক্ষণ পরে সূর্যের উপস্থিতি টের পেলাম। ভর দুপুরের সূর্য, গরম ধাতুর মতন। আমার হতবুদ্ধি অবস্থা তখনো কাটেনি। ঘড়ির দিকে চাইলাম। কাঁটায় কাঁটায় দুপুর।

www.boiRboi.blogspot.com

একা

ডেস্ট্রয়ারে শেষবারের মতন লুই রেনগিফো যখন আমাকে সময় জানতে চায় তখন ১১-৩০টা। আমি আর একবারও সময় দেখেছিলাম যখন ১১-৫০টা, তখনও বিপর্যয় ঘটেনি। এখন লাইফ বোটে সময় দেখেছি পুরোপুরি ১২টা। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে এত সব কিছু হয়ে গেছে। লাইফ বোটে ওঠা, সহকর্মীদের বাঁচানোর চেষ্টা, চুপ করে বোটে দাঁড়িয়ে থাকা, শূন্য সমুদ্রে খোঁজা, হাওয়ার গর্জন শোনা। বুঝলাম ওদের দু'তিন ঘন্টা লাগবে আমাদের উদ্ধার করতে।

দু' বা তিন ঘন্টা, মনে হচ্ছে একা এই সমুদ্রে অসম্ভব দীর্ঘ সময়। তবুও সেই চিন্তাতেই রইলাম। জল নেই, খাবার নেই, বিকেল তিনটের পর নিশ্চয়ই গলা ফাটানো তেষ্টা পাবে। সূর্য আমার শুকনো আর নুন-পোড়া মাথা, গায়ের চামড়া জ্বালিয়ে দিচ্ছে। টুপিটা হারিয়ে ফেলেছি, মাথায় খানিকটা জল ছিটিয়ে দিয়ে, বোটের পাশে বসে রইলাম, কখন আমাকে উদ্ধার করবে।

ঠিক এই সময় ডান হাঁটুতে যন্ত্রণা অনুভব করলাম। নীল সুতো মোটা ভেজা প্যান্ট মুড়তে বেশ কষ্ট। তুলে দেখে আমি অবাক। হাঁটুর নিচে একটা অর্ধেক চাঁদের মতো গভীর ঘা। বুঝতে পারলাম না জাহাজের গায়ে ধাক্কা লেগেছে, না জলে পড়ার সময় লেগেছে। লাইফ বোটে বসার আগে বুঝতেও পারিনি। একটু জ্বালা করছে, কিন্তু রক্ত পড়ছে না, বোধহয় নোনা জলের জন্যই একদম শুকিয়ে গেছে।

কি করব বুঝতে না পেরে আমার জিনিসপত্রগুলোই খুঁজতে লাগলাম। সমুদ্রের এই একাকীত্বের মধ্যে কি আছে আমার। প্রথমত ঘড়ি — এটাকে নির্ভর করা যায় পাক্কা সময় দিচ্ছে। আমি দু'তিন মিনিট অন্তরই তার দিকে তাকাচ্ছি। এর পর আমার সোনার আংটি, কারটাগেনায় গত বছর কিনেছিলাম। আর একটা চেন, ভার্জিল অবকারমেনের মেডেল ঝোলানো। এটাও কারটাগেনায় পঁয়ত্রিশ পেস্রোতে একজন নাবিকের কাছ থেকে কেনা। পকেটে শুধু ডেস্ট্রয়ারে আমার লকারের চাবি আর তিনটে ব্যবসায়িক কার্ড, (মেরির সঙ্গে কেনাকাটা করতে গিয়ে) মবিলের একটা দোকানে আমায় দিয়েছিল। কিছুই করার নেই, তাই সেই কার্ডগুলোই বার বার পড়তে লাগলাম। এইভাবেই নিজেকে ব্যস্ত রাখা, যতক্ষণ না কেউ এসে উদ্ধার করছে। কেন জানি না জাহাজ ডুবে গেলে নাবিকেরা বোতলে করে যে বার্তা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়, এই কার্ডগুলোকে তারই মতন মনে হচ্ছিল। ভাঙা জাহাজের নাবিকেরা যা করে, আমার কাছে একটা বোতল থাকলে, আমি একটা কার্ড ভরে দিতাম। কারটাগেনায় বন্ধুদের মজা করে বলার মতো একটা ঘটনা।

বই নং
তারিখ
ফোন
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি
www.boiRboi.blogspot.com

৪

ক্যারিবিয়ানে একা প্রথম রাত্রি

বিকেল চারটে নাগাদ ঝড় বন্ধ হলো। জল আর আকাশ ছাড়া কিছুই দেখার নেই। কিছুই করার নেই। দু'ঘন্টা চলে গেছে, এখন বুঝছি বোটটা ভেসে চলেছে। আসলে ওঠার পর থেকেই হাওয়ার টানে বোট সোজা এগিয়ে চলেছে। আমি দাঁড় টানলেও এত জোরে পারতাম না। কোন্ দিকে যাচ্ছি, কোথায় আছি, কিছুই বুঝছি না। বোটটা পাড়ের দিকে যাচ্ছে না ক্যারিবিয়ানের একেবারে মাঝখানে গিয়ে পড়ছি তাও জানি না। পরেরটাই মনে হচ্ছে ঠিক, কেন না পঞ্চাশ মাইল দূরের কোনো জিনিস সমুদ্রের ধাক্কায় পাড়ে চলে আসা অসম্ভব। বিশেষ করে একটা বোটের মধ্যে মানুষের মতো একটা ভারী জিনিস।

পরের দু'ঘন্টা ডেস্ট্রয়ারের এই যাত্রার সমস্ত ঘটনাটা মিনিটে মিনিটে ভাগ করে সাজাতে লাগলাম। আমার যুক্তিতে যদি রেডিও অপারেটার কারটাগেনায় যোগাযোগ করে থাকে, দুর্ঘটনার আসল অবস্থাটা জানিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে সেই মুহূর্তে তারা প্লেন আর হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের উদ্ধার করতে। আমি হিসাব করলাম, তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে আমার মাথার উপর প্লেন উড়ে আসবে।

দুপুর একটায় আমি বোটের ওপর বসে দিগন্ত খুঁজতে লাগলাম। তিনটে দাঁড় জড়ো করলাম, যেদিকে প্লেন দেখতে পাবো সেই দিকেই বেয়ে যাবো। মিনিটগুলো দীর্ঘ আর উত্তেজনায় টান টান। সূর্য আমার মুখ আর গা ঝাঁঝিয়ে দিচ্ছে, নুনে কেটে ঠোঁট পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু খিদেও নেই, তেষ্টাও নেই, এখন যা চাই তাহলো একটা শুধু প্লেন উড়ে আসুক। পরিকল্পনাটা ছকে রাখলাম। যখনই প্লেন দেখব তখনই সেদিকে দাঁড় বেয়ে যাবো। মাথার ওপরে যখন আসবে, আমি বোটে দাঁড়িয়ে উঠে, সার্ট উড়িয়ে সঙ্কেত জানাবো। যাতে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না হয়, আগেই তৈরি থাকতে পারি, তাই শার্টের বোতাম খুলে ফেললাম। বোটের কোণে বসে রইলাম, দিগন্তের চারপাশ নজর রেখে। কোন ধারণাই নেই কোনদিক থেকে প্লেন আসবে।

দুটো বাজে। হাওয়ার গর্জন চলেছে। সে আওয়াজ ছাড়িয়ে লুই রেনগিফোর গলা এখনো শুনতে পাচ্ছি ঃ "ফাত্সো, এদিকে বেয়ে এসো।" একেবারে যেন পরিষ্কার শুনলাম। সে যেন এখানেই রয়েছে। মাত্র দু মিটার দূরে, দাঁড়টার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করছে, সমুদ্রে হাওয়ার কান্নায়, পাথরের খাঁড়িতে ঢেউয়ের ঝাপটায়, স্মৃতির ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর শোনা যায়। শুনতেই হবে পাগল করে দেওয়া উন্মত্ত নাছোড়বান্দা কণ্ঠস্বর — "এদিকে বেয়ে এসো।"

তিনটের সময় অধৈর্য হয়ে গেলাম। এই সময়ই ডেস্ট্রয়ারের কারটাগেনায় পৌঁছনোর কথা। আমার বন্ধুরা ফিরে আসার আনন্দে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই আমার কথা চিন্তা করছে। এইসব ভাবনা আমার শক্তি আর ধৈর্য যোগালো চারটে পর্যন্ত। যদি ওরা রেডিওতে খবর না পাঠিয়েও থাকে, আমরা জাহাজ থেকে পড়ে গেছি যদি ওদের নজরেও না আসে, বন্দরে পৌঁছলে নিশ্চয়ই বুঝবে। জাহাজের সমস্ত নাবিক যখন ডেকের ওপর দাঁড়াবে। খুব দেরি হলে তিনটে। তখনই তারা সতর্ক হবে।

প্লেন যদি ছাড়তেও দেরি করে, আধ ঘন্টার মধ্যে তারা দুর্ঘটনার জায়গায় এসে পৌঁছবে। চারটে। খুব দেরি হলে চারটে পনেরোর মধ্যে প্লেন মাথার ওপর ঘুরপাক খাবে। যতক্ষণ না হাওয়া বন্ধ হয়ে এলো আমি দিগন্তে খুঁজতেই লাগলাম। এক বিশাল নিঃস্তব্ধতায় ঢাকা পড়ে গেলাম।

তারপর থেকে আর লুই রেনগিফোর আর্তনাদ শুনতে পেলাম না।

বিশাল রাত্রি

প্রথম তিন ঘন্টা একা সমুদ্রে অসহ্য লাগছিল। পাঁচ ঘন্টা পার হয়ে গেছে, সেও পাঁচটার সময়। মনে হচ্ছে আরো এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে পশ্চিমে। বিরাট লাল সূর্য। নিজেকে মানিয়ে নিতে লাগলাম। সূর্য বাঁদিকে, আমি বুঝতে পারছি কোন্ দিক থেকে প্লেন আসবে। সেদিকে তাকিয়ে আছি সোজা। নড়ছিনা। ভয়ে চোখ বুঁজছি না। আমার ধারণামতো যেদিকে কারটাগেনা, সেইদিক থেকে এক মুহূর্তেও দৃষ্টি সরাচ্ছি না। ছ'টা নাগাদ চোখ ব্যথা হয়ে গেল। তবুও আমি তাকিয়ে আছি। অন্ধকার হয়ে আসছে। তবুও অসীম ধৈর্য নিয়ে আছি। ইঞ্জিনের শব্দ শোনার আগে, ওদের লাল সবুজ আলো দেখতে পাবো, আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আলো দেখতে চাইলেও আমি ভুলে যাচ্ছিলাম যে অন্ধকারে প্লেনের কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। তাড়াতাড়ি আকাশ লাল হয়ে গেল। আমি তবুও দিগন্তের দিকে চেয়ে। তারপর আকাশ গভীর বেগুনি রঙ। আমি শুধু তাকিয়ে আছি। লাইফ বোটের একদিকে বসে দেখছি হুইস্কি রঙ আকাশের গায়ে হলুদ হীরের মতন প্রথম তারাটি ফুটে উঠল, নিশ্চল, নিখুঁত। যেন সঙ্কেত জানাচ্ছে। তারপরেই নেমে এলো রাত্রি।

গভীর অন্ধকারে ডুবে গেছি। এত অন্ধকার যে নিজের হাতের পাতা পর্যন্ত দেখা যায় না। মনে হলো এই আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারব না। লাইফ বোটে ঢেউয়ের ধাক্কা দেখে বুঝেছিলাম, যে এগিয়ে চলেছি। আস্তে আস্তে, কিন্তু বাধাহীনভাবে। অন্ধকারে ডুবে গিয়ে মনে হলো দিনের বেলা এত একা লাগেনি। কিন্তু এই অন্ধকারে, লাইফ বোটে ভয়ানক একা। কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি নিঃশব্দে বেয়ে চলেছি। অদ্ভুত সব প্রাণীতে ভরা গভীর সমুদ্রে। একাকীত্ব কাটাতে ঘড়ির দিকে দেখলাম। সাতটা বাজতে দশ। বেশ কিছুক্ষণ পরে, যেন দু'তিন ঘন্টা

পেরিয়ে গেছে — ঘড়িতে সাতটা বাজতে পাঁচ। যখন মিনিটের কাঁটা বারোটায় পৌঁছেছে, ঠিক সাতটা। তারায় তারায় ভরে গেল আকাশ। মনে হচ্ছে কত সময় চলে গেছে। এখন প্রায় ভোর। আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতন প্লেনের কথাই চিন্তা করতে লাগলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

ঠাণ্ডা লাগছে। এই ধরনের বোটে এক মিনিটও শুকনো থাকা মুশকিল। ওপরে বসলেও শরীরের অর্ধেক জলের নিচেই থাকছে, কারণ নিচটা একটা ঝুড়ির মতন। আধ মিটার জলের নিচে। আটটার সময় জল আর হাওয়ার মতন ঠাণ্ডা নয়। সমুদ্রের প্রাণীদের থেকে বাঁচতে বোটের নিচের দিকটাই নিরাপদ। কারণ নিচটা দড়ির জাল দেওয়া। ওদের বেশি কাছে আসতে দেবে না। অবশ্য এসব স্কুলে শেখা। স্কুলে বসেই বিশ্বাস করা। দুপুর দুটোয়, চল্লিশজন ছাত্রের সঙ্গে, একটা বেঞ্চে বসে, শিক্ষক যখন লাইফ বোটের একটা মডেল নিয়ে বিষয়টা শেখাচ্ছেন। আর রাত আটটায় সমুদ্রে যখন একা, কোনো আশা নেই, তখন শিক্ষকের সেই কথাগুলো অর্থহীন। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার অর্ধেকটা মানুষের জন্য নয়, সমুদ্রের প্রাণীদের জন্যই খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া শার্টে ঝাপটা দিচ্ছে, তা সত্ত্বেও আমি ওপর থেকে নড়ছি না। শিক্ষকদের মতে ওপর অংশটাই সব থেকে কম নিরাপদ। তবুও সব কিছু ভেবে, সেই জায়গাটাই আমার মনে হচ্ছিল, সমুদ্রের প্রাণীদের থেকে সবচেয়ে দূরে। শুনতে পাচ্ছি বিশাল অজানা জন্তুরা বোটের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

সেই রাত্তিরে অগুন্তি তারার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া সপ্তর্ষিকে খুঁজে বার করতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল। এত তারা কোনোদিন দেখিনি। আকাশের বিস্তার জুড়ে একটু ফাঁকা জায়গা বার করা মুশকিল। সপ্তর্ষি একবার খুঁজে পেয়ে, আর অন্য কোনোদিকে তাকাতে পারলাম না। কেন জানি না সেই দিকে তাকিয়ে কম নিঃসঙ্গ লাগছিল।

কারটাগেনায় যখন বন্দরের ছুটি কাটাতাম, তখন আমরা সকালে প্রায়ই জমা হতাম মাঙ্গা ব্রীজের নিচে। রেমন হেরেরা ড্যানিয়েল স্যান্টোসের গলা নকল করে গান গাইত। কেউ তার সঙ্গে গীটারে সুর মেলাত। সেই পাথুরে ব্রীজের দেওয়ালে বসে আমি দেখতাম — সপ্তর্ষি উঠেছে সেরোডে লা পোপার দিকে। সেই রাত্তিরে বোটের ওপর বসে, এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, আমি মাঙ্গা ব্রীজে ফিরে গেছি। পাশে রেমন হেরেরা গান গাইছে, গীটারের তালে তালে। সপ্তর্ষি যেন পৃথিবী থেকে দু'শো মাইল দূরে নয়। সেরোডে লা পোপা'র মাথাতেই নেমে এসেছে। আমি কল্পনা করলাম, হয়তো কারটাগেনায় কেউ এখন তাকিয়ে আছে সপ্তর্ষির দিকে। আমি দেখছি তাকে সমুদ্রের মধ্যে। নিজেকে আর একা লাগছে না।

সমুদ্রের প্রথম রাত বড়ো দীর্ঘ কারণ একেবারেই কিছুই ঘটল না। এই লাইফ বোটে রাত কাটানোর বর্ণনা অসম্ভব, কারণ কিছুই ঘটছিল না। শুধু ভয় অচেনা প্রাণীদের। হাতে শুধু ঘড়ির ডায়ালটা ঝকঝক করছে, প্রতি মিনিটে তার দিকে তাকানো বন্ধ করা যাচ্ছে না। ফেব্রুয়ারির ২৮শের রাত্রি। সমুদ্রে আমার প্রথম রাত্রি।

মিনিটে মিনিটে আমি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম। এ এক অত্যাচার। অধৈর্য হয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম ঘড়ি দেখা বন্ধ করব, ঘড়িটা পকেটে পুরব, যাতে সময়ের ওপর অতটা নির্ভরশীল না হই। ন'টা বাজতে কুড়ি পর্যন্ত নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম। তখনো ক্ষিধে বা তেষ্টা পায়নি। আমি নিশ্চিত পারব, — এইভাবেই পারব, পরের দিন সকাল পর্যন্ত যতক্ষণ না প্লেন এসে পৌছবে। মনে হচ্ছিল, শুধু এই ঘড়িই আমাকে পাগল করে দেবে। নিজেরই উদ্বেগে বন্দী। ওটাকে কব্জি থেকে খুলে নিলাম পকেটে পুরব বলে। মনে হলো এর থেকে ভালো হবে যদি ঘড়িটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দি। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা হলো। হঠাৎ আতঙ্কিত হলাম এই ভেবে, যে ঘড়ি ছাড়া আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ব। সেটাকে আবার কব্জিতে বাঁধলাম। আবার দেখতে লাগলাম মিনিটে মিনিটে, সেই বিকেল বেলার মতন। আর প্লেনের খোঁজে তাকিয়েই রইলাম দিগন্তের দিকে, যতক্ষণ না চোখে ব্যথা ধরে যায়।

মাঝ রাত্তিরের পর আমার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করল। এক মুহূর্তের জন্য ঘুমোইনি, ঘুমোতে চাইওনি। বিকেলের মতন একই আশায় প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছি। জাহাজের আলোও খুঁজছি। ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে আছি ; শান্ত, গভীর, নিঃস্তব্ধ সমুদ্রের দিকে। আকাশের নক্ষত্র ছাড়া, আর কোনো আলো নেই।

ভোর বেলা ঠাণ্ডা একটু বেশি। শরীরটা যেন ঝলসে যাচ্ছে। গত বিকেলের সূর্যের সমস্ত তাপ জমে আছে চামড়ার নিচে। ঠাণ্ডা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা করছে। মাঝরাত্তির থেকে ডান হাঁটুতেও ব্যথা করছে। মনে হচ্ছে একেবারে হাড়ের মধ্যে জল ঢুকে গেছে। কিন্তু এই ভাবনাগুলো অন্ধকার জলের মৃদু আওয়াজের মধ্যে, যদি শুধু একটা জাহাজের আলো দেখতে পাই, তবে এমন চিৎকার করব তা' যত দূর থেকেই হোক ঠিক শোনা যাবে।

প্রতিদিনের আলো

পাড়ের মতন সমুদ্র আস্তে আস্তে ভোর হলো না। প্রথমে আকাশ বিবর্ণ, তারাগুলো একে একে সরে গেল। ঘড়ির দিকে দেখলাম, তারপর দিগন্তে। সমুদ্রের চেহারাটা আবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বারো ঘন্টা চলে গেছে কিন্তু কিছু মনেই হচ্ছে না। দিনের মতন দীর্ঘ হতে পারে না। কিন্তু রাত্রির সমুদ্রে লাইফ বোটে বসে, ঘড়ির দিকে দেখতে দেখতে বোঝা যায়, রাত্রি দিনের থেকেও দীর্ঘ। সকাল নেমে আসছে। আর একটা দিন।

বোটে প্রথম রাত কাটল এইভাবেই। সকাল হয়ে গেছে, কিছুই আর এসে যায় না। খাওয়ার কথাও ভাবছি না, তেষ্টার কথাও ভাবছি না। হাওয়া একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, আর সমুদ্রের ওপরটা এখন শান্ত, সোনালী। সারা রাত্তির এক মুহূর্তও ঘুমোইনি। তবুও মনে হচ্ছিল এক্ষুনি জেগে উঠেছি। বোটে শরীরটাকে একটু এলিয়ে দিয়ে বুঝলাম হাড়ের মধ্যে ব্যথা হচ্ছে, চামড়া জ্বালা করছে। দিনটা চমৎকার, উষ্ণ, সুন্দর হাওয়া বইছে। আমাকে আরো অপেক্ষা করার শক্তি যোগাচ্ছে। লাইফ বোটে

বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। বিশ বছরের জীবনে এই প্রথম নিজেকে সুখী মনে হচ্ছে। বোটটা সমানে এগিয়েই চলেছে। সারা রাত্তির কত দূর চলেছে বুঝতে পারছি না। কিন্তু দিগন্ত এখনো একই রকম লাগছে, যেন এক সেন্টিমিটারও এগোয়নি। সাতটার সময় ডেন্ট্রিয়ারের কথা মনে পড়ল। সকালের জল খাবারের সময় আমার জাহাজের বন্ধুরা টেবিলের চারপাশে বসে আপেল খাচ্ছে। তারপর আসবে ডিম, মাংস, পাঁউরুটি আর কফি। আমার জিভে জল এসে গেল। পেটের মধ্যে একটা মোচড়। খাওয়ার চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে নেবার জন্য বোটের তলার দিকে গা এলিয়ে দিলাম। রোদে-পোড়া পিঠে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা বেশ ভালো লাগছে, শরীরের শক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম রেমন হেরেরাকে নিয়ে কেন ডেকে দাঁড়াতে গেলাম। কেন নিজের বাঙ্কে এসে শুয়ে পড়লাম না। প্রতিটা মিনিট ভেঙে ভেঙে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটাকে মনে করার চেষ্টা করলাম। কোনো কারণই ছিল না আমার এই ঘটনার শিকার হওয়ার। যখন নজরদারিতে ছিলাম না, তখন ডেকে দাঁড়ানোরও কোনো দরকার ছিল না। যখন সব মিলিয়ে মনে হলো — যা ঘটেছে তা আমার ভাগ্য দোষে — আমি আবার দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজেকে শান্ত করছি। দিনটা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এখন সাড়ে এগারোটা।

দিগন্তে একটা কালো বিন্দু

দিন যত গড়িয়ে এলো, আমি আবার কারটাগেনার কথা ভাবতে লাগলাম। অসম্ভব, ওরা দেখেনি, আমি হারিয়ে গেছি। অনুশোচনা হচ্ছিল কেন লাইফ বোটে উঠলাম। আমার সহকর্মীদের নিশ্চিত উদ্ধার করা হয়েছে। আমিই একা ভাসছি। বোট হাওয়ার টানে চলে এসেছে। আমার ভাগ্য খারাপ বলেই আমি এই লাইফ বোটে।

এই ভাবটা দানা পাকাবার আগেই দেখলাম দিগন্তে একটা কালো বিন্দু। দৃষ্টি আটকে রইল সেইটাতে। বিন্দুটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এক নজরে তাকিয়ে আছি। সারা আকাশটা চোখের মধ্যে ঝলমল করে উঠল। কালো বিন্দুটা আরো কাছে, সোজাসুজি বোটের দিকে আসছে। দু'মিনিট দেখতে দেখতে শরীরটাও ফুটে উঠল। নীল ঝলমলে আকাশের মধ্যে চোখ ধাঁধানো ধাতুর ছটা বেরোচ্ছে। আমি ক্রমেই অন্য দাগগুলোর থেকে এর পার্থক্যটা বুঝতে পারলাম। ঘাড় ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, চোখ সহ্য করতে পারছে না আকাশের বিশালতা। তবু তাকিয়ে আছি। ওটা দ্রুত এগিয়ে আসছে সোজা বোটের দিকে। আমার খুশিও লাগছে না, কোনো গভীর আবেগও নয়। নিপুণ আর শান্তভাবে বোটের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। প্লেনটা এগিয়ে আসছে। আমি শার্টটা খুলে ফেললাম। জানি কোন্ মুহূর্তে আমাকে সঙ্কেত জানাতে হবে। এক মিনিট, দু'মিনিট, হাতে শার্ট, প্লেনটা আরো কাছে আসুক। সোজা নৌকার দিকে যখন এগিয়ে এলো, আমি হাত তুলে শার্টটা নাড়তে লাগলাম। ঢেউয়ের আওয়াজ ছাড়িয়ে শুনতে পেলাম প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ।

www.boiRboi.blogspot.com

৫

লাইফ বোটে আর একজন সঙ্গী

পাঁচ মিনিট ধরে শার্টটাকে ওড়ানোর পর হঠাৎ বুঝলাম আমি ভুল করেছি। প্লেনটা বোটের দিকেই আসছে না। আমি কালো চিহ্নটার দিকে তাকাচ্ছিলাম, সেটা ক্রমশ বড় হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল প্লেনটা মাথার ওপর দিয়েই যাবে। কিন্তু ওটা অনেক দূর, আর অনেক ওপর দিয়ে চলে গেল। আমাকে মিলিয়ে গেল। বোটের ওপর দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত সূর্যের নিচে আমি সেই কালো চিহ্নটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুই চিন্তা করার নেই। ওটা একেবারেই মিলিয়ে গেছে দিগন্তে। আবার উঠে বসলাম। দমে গেছি, কিন্তু আশা ছাড়িনি। সূর্য থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। ফুসফুসকে রক্ষা করতে হবে সূর্যরশ্মি থেকে।

বোটে ঠিক চব্বিশ ঘন্টা কাটিয়েছি। একবার একপাশে শুয়ে পড়লাম। মুখের ওপর ভেজা শার্টটা রাখলাম। ঘুমোবার চেষ্টা করলাম না, কারণ তাতে কি বিপদ হতে পারে জানি, যদি বোটের ওপরের দিকে ঝিমিয়ে ঢুলে পড়ি। প্লেনটার কথা ভাবলাম। খুব নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না যে ওরা আমাকে খুঁজছিল। আর প্লেনটাকে আমি ঠিক মতো চিহ্নিত করতে পারিনি।

বোটের ওপর শুয়ে শুয়ে তৃষ্ণার যন্ত্রণা ভোগ করতে শুরু করেছি। থুথু ভারী হয়ে যাচ্ছে, গলা শুকিয়ে কাঠ। ইচ্ছে করছে সমুদ্রের জল খাই, জানি এতে ক্ষতি হবে, পরেও খেতে পারি। হঠাৎ জল তেষ্টার কথা ভুলে গেলাম। সোজাসুজি মাথার ওপর ঢেউয়ের আওয়াজ ছাপিয়ে আর একটা প্লেন।

বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলাম। প্লেনটা এগিয়ে আসছে, আগের প্লেনটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিক থেকেই। সোজা বোটের দিকেই আসছে। মাথার ওপর আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আবার শার্ট ওড়াতে লাগলাম। কিন্তু প্লেনটা অনেক ওপর আর অনেক দূর দিয়ে উড়ে গেল, তারপর মিলিয়ে গেল। আবার ফিরে এলো। আকাশের মধ্যে ওটার চেহারাটা দেখতে পেলাম। যেদিক থেকে উড়ে এসেছিল সেদিকেই চলে গেল। এখন ওরা আমাকেই খুঁজছে। বোটের ওপর হাতে শার্ট নিয়ে আরো প্লেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার — প্লেনগুলো আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে। ঐ দিকেই তাহলে মাটি। আমি বুঝতে পারছি এখন কি করতে হবে। কিন্তু কি করে? রাত্তির বেলা যদিও বোটটা অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু এখনো নিশ্চয়ই পাড় থেকে দূরেই আছি। কোন দিকে পাড় বুঝতে পারছি। কিন্তু কতদূর দাঁড়

বাইতে হবে জানি না। সূর্যের তাপে মুরগীর মতন চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে। পেট জ্বলছে ক্ষিদেতে, সব কিছু ছাড়িয়ে জল তেষ্টা। ক্রমশ একটানা নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

১২-৩৫ মিনিট নাগাদ, ঠিক সময়টা দেখিনি, জলে-নেমে পড়ার যন্ত্রপাতি লাগানো একটা বিরাট কালো প্লেন সোজা মাথার ওপর গর্জন করতে লাগল। ওটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দিনটা এত পরিষ্কার যে এও দেখতে পাচ্ছি — একটা লোক কক্‌পিট থেকে ঝুঁকে বাইনোকুলার দিয়ে সমুদ্রে খুঁজছে। প্লেনটা এত নিচু দিয়ে আর আমার এত কাছ দিয়ে যাচ্ছে যে ইঞ্জিনের হাওয়ার ধাক্কা মুখে এসে লাগছে। ওর গায়ে লেখা অক্ষরগুলোও আমি পড়তে পারলাম। কানাল এলাকার উপকূল রক্ষীদের প্লেন।

ওটা যখন ক্যারিবিয়ানের ভিতর দিয়ে ঘুরে গেল, আমার কোনো সন্দেহই রইল না। আমার এই শার্ট ওড়ানো ওরা দেখতে পায়নি। আমি তখনো শার্ট উড়িয়ে যাচ্ছি, আর চেঁচাচ্ছি — "আমাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে।" উত্তেজনায় পাগল হয়ে আমি বোটের ওপর লাফাতে লাগলাম।

আমায় খুঁজে পেয়েছে

পাঁচ মিনিটের মধ্যে কালো প্লেনটা উল্টো দিক থেকে আবার ঘুরে এলো। আগের মতন উচ্চতাতেই বাঁদিকে ঘুরল। সেদিকের জানলাতে আবার দেখলাম একটা লোক বাইনোকুলার দিয়ে সমুদ্র দেখছে। আমি আবার শার্ট ওড়াতে লাগলাম। এবার আর বেপরোয়াভাবে নয়, শান্তভাবে। যেন সাহায্য আর চাইছি না। উৎসাহে ধন্যবাদ, আর অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমার রক্ষা কর্তাদের।

প্লেনটা কাছে এগিয়ে আসছে, যেন ভার হারিয়ে নেমে আসছে। সোজা দাগে একেবারে জলের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। মনে হলো জলেই নামবে। আমি প্রস্তুত হলাম, যেখানে ওটা নামবে সেখাইে দাঁড় বেয়ে যাব। এক মুহূর্ত পর ওটা আবার উড়ে যেতে লাগল। ঘুরে গিয়ে মাথার ওপর এলো — এই নিয়ে তিনবার। শার্টটা তাই আর জোরে নাড়ছি না। প্লেনটা যখন একেবারে বোটের ওপর এলো অল্প সঙ্কেত দেখালাম। অপেক্ষা করছি আবার নিচু দিয়ে কখন উড়ে যাবে। কিন্তু উল্টোটাই হলো, যেদিক দিয়ে এসেছিল মাথা ঘুরিয়ে সেদিকেই চলে গেল। তবুও আমার উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। আমি নিশ্চিত ওরা আমায় দেখেছে। এত নিচ থেকে সোজা বোটের উপর উড়ে এসেও আমাকে দেখেনি হতে পারে না। আরো আস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে, খুশি মনে, অপেক্ষায় বসে রইলাম।

এক ঘন্টা চলে গেল। একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। যেদিক থেকে প্লেনগুলো উড়ে আসছিল সেটা নিঃসন্দেহে কারটাগেনা। কালো প্লেনটা যেখানে মিলিয়ে গেল সেটা পানামা। আমি হিসাব করলাম সোজা দাঁড় বাইলে, আর হাওয়ার

www.boiRboi.blogspot.com

শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এগোলে সম্ভবত ছুটি কাটানোর জায়গা তোলুতে পৌঁছে যাব। দু'টো এলাকার মাঝখানে ঐ জায়গাটা।

মনে হচ্ছে আমাকে এক ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার করবে। কিন্তু এক ঘন্টা চলে গেল। পরিষ্কার শান্ত নীল সমুদ্রে কিছুই ঘটল না। দু'ঘন্টা চলে গেল, আরো এক ঘন্টা, আরো এক ঘন্টা। আমি এক মুহূর্তও বোটের ওপর থেকে নড়ছি না। উত্তেজনায় টানটান হয়ে দিগন্তে খুঁজে চলেছি। একবার চোখও বন্ধ করছি না। পাঁচটায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে আশা ছাড়িনি, কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছি। আমি নিশ্চিত যে ওরা কালো প্লেন থেকে আমায় দেখেছে। কিন্তু উদ্ধার করার কাজে আসতে এত সময় লাগছে কেন? গলা একেবারে শুকনো। নিঃশ্বাস নিতে আরো কষ্ট হচ্ছে। দিগন্তের দিকেই প্রাণপণ তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ পড়ে গেলাম বোটের মাঝখানটাতে। শিকার ধরার জন্য একটা হাঙর খুব আস্তে আস্তে বোটের পাশে চলে এসেছে।

হাঙররা আসে পাঁচটায়

তিরিশ ঘন্টা সমুদ্রে থাকার পর এই প্রথম প্রাণীর সঙ্গে দেখা। হাঙরের ডানা আতঙ্ক জাগায়, কারণ এ জন্তুটা মারাত্মক পেটুক। আসলে কিন্তু ঐ ডানার থেকে নিরপরাধ কিছু নেই। দেখে মনে হয় না এটা কোনো জন্তুর শরীরের অঙ্গ, বিশেষ করে হিংস্র জন্তুর। সবুজ আর রুক্ষ একটা গাছের ছালের মতন দেখতে। বোটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো ওর একটা টাটকা গন্ধও আছে। সবজির খোসার মতন তেতো। পাঁচটা বেজে গেছে। বিকেলের আলোয় সমুদ্র শান্ত। আরো হাঙর এগিয়ে আসছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত, বোটের চারপাশে ঘুরছে, ফিরছে। তারপর আলো একদম চলে গেল। আমি বুঝতে পারছি ওরা এখনো চারপাশে ঘুরছে, শান্ত জলের ওপর তোলপাড় করছে ওদের ডানার পাত।

এরপর থেকে পাঁচটার পর আর বোটের ওপর দিকে বসতাম না। পরের দিনগুলোতে জেনেছিলাম যে হাঙররা সময় মেনে চলা জন্তু। ঠিক পাঁচটার একটু পর ওদের দেখা যাবে, রাত নামলে উধাও হয়ে যাবে।

গোধূলিতে স্বচ্ছ সমুদ্রে নেমে এলো এক অপূর্ব দৃশ্য। বোটের দিকে এগিয়ে আসছে নানা রঙের মাছ। অসংখ্য হলুদ, সবুজ নীল, লাল, ছোপ-কাটা কাটা, গোল ছোট মাছ। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত বোটের সঙ্গে সঙ্গে চলল। মাঝে মাঝে জলে ওদের উজ্জ্বল ঝলকানি। ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্ত, সেই রক্তমাখা জলের ঝাপটা বোটের ওপর। হাঙরে-কাটা খণ্ড খণ্ড মাছ ভেসে যাচ্ছে। হাঙরে ফেলে দেওয়া সবচেয়ে ছোটমাছের খণ্ডটাকে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল।

ক্ষিদে, তেষ্টা আর মরিয়া অবস্থায় সমুদ্রে আমার দ্বিতীয় রাত্রি। মনে হচ্ছে আমি পরিত্যক্ত। তবু আশা নিয়ে আছি আমাকে উদ্ধার করবে। সেই রাতেই ঠিক করলাম,

আমি নির্ভর করে থাকবো শুধু মনোবলের ওপর, আর শরীরের যেটুকু বাকি শক্তি আছে তার ওপর।

একটা বিষয় আমাকেই অবাক করেছে। একটু দুর্বল লাগলেও, আমি একেবারে ভেঙে পড়িনি। চল্লিশ ঘন্টা জল বা খাবার ছাড়াই কাটিয়ে দিয়েছি। দু'দিন দু'রাত্রি ঘুমোইনি। দুর্ঘটনার আগের রাত্তিরেও জেগেছিলাম। তবুও আমি এখনো দাঁড় টানতে সক্ষম।

আবার আকাশে সপ্তর্ষি খুঁজতে লাগলাম। সেদিকেই চোখ রেখে দাঁড় বাইতে লাগলাম। মৃদু হাওয়া বইছে। আমি সপ্তর্ষির দিকে দাঁড় বাইব, কিন্তু হাওয়া বইছে অন্য দিকে। দু'টো দাঁড়ই ওপরে নিলাম, দশটা পর্যন্ত টানব। প্রথমে খুব জোরে, পরে শান্তভাবে। তাকিয়ে আছি সপ্তর্ষির দিকে, আমার কল্পনায় সেরো-ডে লা পোপা'র ওপর ওটা জ্বল জ্বল করছে।

জলের আওয়াজে বুঝছি, আমি সমানে এগোচ্ছি। যখন ক্লান্ত হয়ে গেলাম, দাঁড় দুটো আড়াআড়ি রেখে মাথা নিচু করে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হলো। আবার চেপে ধরলাম দাঁড়, আরো জোরে, আরো আশা নিয়ে। এখন মাঝরাত, আমি বেয়েই চলেছি।

একজন সঙ্গী

রাত দুটো নাগাদ আমি একেবারে বিপর্যস্ত। দাঁড় দুটো গায়ে গায়ে রেখে, ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। ভয়ঙ্কর তৃষ্ণার্ত, কিন্তু না খাওয়ার জন্য কিছু হচ্ছে না। এত ক্লান্ত যে মাথাটা দাঁড়ের ওপর রেখে মরার জন্য তৈরি হলাম। আর ঠিক তখনই দেখলাম, জেম ম্যানজারেস ডেস্ট্রয়ারের ডেকে বসে বন্দরের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। বোগোতার জেম ম্যানজারেস নৌ বাহিনীতে আমার সবচেয়ে পুরনো বন্ধু। আমার অন্য বন্ধুদের কথা আমি ভেবেছি — তারা অন্য বোটে পৌছতে পেরেছে কিনা ডেস্ট্রয়ার তাদের হাতে তুলে নিতে পেরেছে কিনা, প্লেন তাদের চিহ্নিত করতে পেরেছে কিনা। কিন্তু আমার কখনো জেম ম্যানজারেসের কথা মনে পড়েনি। তবু চোখ বুজতে তাকেই দেখতে পেলাম। হাসছে। বন্দরের দিকে দেখাচ্ছে। জাহাজের খাবার ঘরে বসে আছে আমার সামনে। হাতে প্লেট ভর্তি ফল আর ডিম-ভাজা।

প্রথমে ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো লাগল। কিন্তু আমি চোখ বুজলেই কয়েক মিনিট ঘুমোলেই জেম ম্যানজারেসকে দেখতে পাচ্ছি। একই সময়, একই জায়গায়, দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে কথা বলব ঠিক করলাম। প্রথমে কি জিজ্ঞাসা করলাম মনে নেই। সে কি উত্তর দিল তাও মনে নেই। মনে হচ্ছিল আমরা দু'জন ডেকের ওপরে কথা বলছি। তারপরেই হঠাৎ ঢেউয়ের ধাক্কা। এগারোটা পঞ্চান্ন'র সেই সর্বনাশা ঢেউ। আমি এক ঝাঁকুনিতে উঠে বসলাম। আমার সমস্ত শক্তি জড়ো করলাম, সমুদ্রে যাতে পড়ে না যাই। ঠিক ভোরের আগে আকাশ কালো হয়ে গেল। এত ক্লান্ত ঘুমোতেও

পারছি না। আমাকে অন্ধকার ঘিরে রেখেছে। বোটের ও প্রান্তটা দেখার চেষ্টাও ছেড়ে দিলাম। রহস্যের স্বপ্ন জালেই জড়িয়ে রইলাম। চেষ্টাও করলাম রহস্য ভেদ করতে। জেম ম্যানজারেসকে দেখতে পাচ্ছি বোটের ওপর তার পোশাক পরে, নীল প্যান্ট, আর শার্ট, ডান কানের দিকে হেলানো টুপি। অন্ধকারের মধ্যেও টুপির ওপর লেখাটা স্পষ্ট পড়তে পাচ্ছি। 'এ আ সি ক্যালডাস'।

ভূমিকা ছাড়াই বললাম, "কেমন আছো?"

নিঃসন্দেহে জেম ম্যানজারেসই। সন্দেহ নেই যে, সমস্ত সময় সে এখানেই ছিল। এটা যদি কল্পনা হতো কিছু এসে যেত না, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ জেগে আছি। একেবারেই সহজ, স্বাভাবিক। পরিষ্কার ঝড়ের ডাক শুনছি, সমুদ্রের আওয়াজ শুনছি। আমি ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত। এতটুকু সন্দেহ নেই, জেম ম্যানজারেস আমার সঙ্গে বোটেই আছে।

সে জিজ্ঞাসা করল — "তুমি জাহাজে যথেষ্ট পরিমাণ জল খাওনি কেন?"

"আমরা তো প্রায় কারটাগেনায় পৌঁছে গেছি" — আমি বললাম। "আমি রেমন হেরেরার সঙ্গে স্টার্ন ডেকে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।"

এটা কোনো ভৌতিক ব্যাপার নয়। আমিও ভয় পাইনি। আমার অদ্ভুত লাগছিল যে এতক্ষণ কেন একা একা লাগছিল। বুঝতে পারিনি আর একজন নাবিক আমার সঙ্গেই বোটে আছে।

"তুমি খাওনি কেন?" জেম ম্যানজারেস আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমার পরিষ্কার মনে আছে উত্তর দিয়েছিলাম — "ওরা আমায় খাবার দিতে চায়নি। আমি আপেল আর আইসক্রিম চেয়েছিলাম। ওরা দেয়নি। জানি না কোথায় খাবার লুকিয়ে রেখেছিল।"

জেম ম্যানজারেস উত্তর দিল না। এক মুহূর্তের জন্য চুপ। ঘুরে আমাকে কারটাগেনা যাওয়ার দিকটা দেখাচ্ছিল। সে যে দিকে দেখাচ্ছিল, সেই নির্দেশ মতোই চলছিলাম। তীরের আলো দেখতে পেলাম, আর দেখলাম বন্দরের বয়াগুলো নাচছে। 'আমরা এসে গেছি' — এই বলে আমি বন্দরের আলোগুলোর দিকে এক নজরে চেয়ে আছি। কোনো আবেগ ছাড়াই, কোনো আনন্দ ছাড়াই, যেন একটা স্বাভাবিক সমুদ্র যাত্রার শেষে ফিরে আসছি। আমি জেম ম্যানজারেসকে বললাম, যে আর একটু দাঁড় বাইতে হবে। কিন্তু সে আর নেই। আমি বোটে একা। বন্দরের আলোগুলো হয়ে গেল সূর্যের রশ্মি। সমুদ্রে আমার একাকিত্বের তৃতীয় দিনের প্রথম সূর্যের আলো।

www.boiRboi.blogspot.com

৬

উদ্ধারকারী জাহাজ আর মানুষ-খেকোর দ্বীপ

প্রথমে আমি দিন ধরে ধরে সময়ের হিসাব করছিলাম। ২৮শে ফেব্রুয়ারি দুর্ঘটনার দিন। দ্বিতীয় দিনটা প্লেনগুলোর। তৃতীয় দিন সবচেয়ে কঠিন, বিশেষ কিছুই ঘটল না। বোট হাওয়ায় এগিয়ে চলেছে। আমার দাঁড় বাইবার শক্তি নেই। দিনটা মেঘে ঢাকা। ঠাণ্ডা লাগছে। ধৈর্য থাকছে না। সূর্যও দেখতে পারছি না। এই সকালে আমি বুঝতেই পারতাম না কোনদিক থেকে প্লেন উড়ে আসছে। এই বোটের মুখও নেই পেছনও নেই। চৌকো মতন, কোন পাশে চলে বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে ঘুরে যায়। যেহেতু কোনো ভ্রমণ চিহ্ন নেই, কিছুতেই বোঝা যায় না বোটটা সামনে যাচ্ছে না পেছনে। চারদিকে সমুদ্র একই রকম। বুঝতে পারছি না যে বোটটা এগোনোর পথ বদলেছে, না একেবারেই ঘুরে গেছে। তৃতীয় দিনের পর সময় নিয়েও একইরকম হলো।

মাঝ দুপুরে আমি দুটো জিনিস ঠিক করলাম। প্রথমত একটা দাঁড় বসিয়ে দিলাম। নৌকোর এক প্রান্তে, যাতে বুঝতে পারি একই দিকে চলছে কিনা। দ্বিতীয় আমার চাবি দিয়ে বোটের ওপর যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে, একটা করে আঁচড় কেটে রাখলাম, দিন ধরে ধরে। প্রথম আঁচড়ের সংখ্যা ২৮। দ্বিতীয় আঁচড় করলাম ২৯। তৃতীয় আঁচড়ের পাশে ৩০। একটা ভুল করলাম। ভাবলাম তিরিশ, আসলে সেটা দোসরা মার্চ। চতুর্থ দিন সেটা বুঝতে পারলাম। যখন মাসটা তিরিশ না একত্রিশ দিনে শেষ হয়েছে ভাবতে লাগলাম। তখনই মনে হলো এটা ফেব্রুয়ারি মাস। যদিও এটা একটা ছোটখাটো ভুল। কিন্তু এই ভুলটাই, সময় সম্পর্কে আমাকে এক বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিল। চতুর্থ দিনে আমি নিশ্চিত বুঝতে পারলাম না, সব মিলে ক'টা দিন বোটে কাটিয়েছি। তিনদিন? চারদিন? পাঁচদিন? আমার চিহ্ন অনুযায়ী তিনদিন। সে ফেব্রুয়ারি কি মার্চ তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু একেবারে নিশ্চিত হতে পারছি না। যেমন বুঝতেও পারছি না, বোটটা সামনে এগোচ্ছে না পেছোচ্ছে। আরও বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য ভাবলাম যেভাবে যা চলছে তাই চলুক। উদ্ধার পাবার সব আশাই একদম হারিয়ে ফেললাম।

এখনও পর্যন্ত জল বা খাবার কিছুই খাইনি। চিন্তা করতেও চাইছি না, কারণ চিন্তা সাজাতেও কষ্ট করতে হচ্ছে। আমার চামড়া, রোদে পুড়ে দারুণ কষ্ট দিচ্ছে। ফোস্‌কায় ভরে গেছে। নৌ কেন্দ্রে শিক্ষকেরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন কিছুতেই

ফুসফুসে সূর্যের রশ্মি না লাগে। এটাও একটা দুর্ভাবনা। আমি ভেজা শার্ট খুলে ফেলেছি, কোমরে বেঁধেছি। তিনদিন জল খাইনি। তাই ঘাম হওয়া সম্ভব নয়। গলায়, বুকে কাঁধের নিচের হাড়ে ব্যথা করছে। চারদিন পরে একটু সমুদ্রের জল খেয়ে নিলাম। তেষ্টা মেটে না, কিন্তু আরামদায়ক। এত সময় ধরে আমি জল না খেয়েই থেকেছি, এইজন্যে যে দ্বিতীয়বার আরও কম জল খাওয়া উচিত। আর অনেক ঘন্টা পার করে।

প্রতিদিন পাঁচটায় একেবারে অবাক করে দিয়ে, ঠিক সময় ধরে হাঙরের দল আসে। বোটের চারপাশে ভোজ সভা শুরু হয়ে যায়। বিরাট বিরাট মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠবে। একটু পর ভেসে উঠবে তাদের টুকরো টুকরো দেহ। ক্ষিপ্ত হাঙরগুলো নিঃশব্দে উঠে আসবে রক্তমাখা জলের ওপর। এখনও ওরা বোটটা ভাঙার চেষ্টা করেনি। কিন্তু এর সাদা রঙ ওদের আকৃষ্ট করেছে। সবার ভাবনা যে সাদা জিনিস দেখলেই হাঙরদের আক্রমণ বেড়ে যায়। হাঙরদের ক্ষীণদৃষ্টি, সাদা আর জ্বলজ্বলে জিনিস দেখতে পায়। আমার মনে পড়ল শিক্ষকের আরেকটি পরামর্শ — 'সব জ্বলজ্বলে জিনিস লুকিয়ে রেখো, যাতে হাঙরদের দৃষ্টি না পড়ে।'

আমার জ্বলজ্বলে কিছুই নেই। ঘড়িটা কালো, এর মুখটাও। আরও ভালো হতো কাছে কিছু সাদা জিনিস থাকলে। হাঙর বোটের ওপরে ওঠার চেষ্টা করলে আমি সেটা ফেলে দিতাম দূরে। চতুর্থ দিন থেকে, প্রতি সন্ধ্যায় পাঁচটা বেজে গেলে, দাঁড় ধরে তৈরি থাকতাম আমি রক্ষার জন্য।

একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে

রাত্তিরে বোটের ওপর একটা দাঁড় রেখে ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। জানি না, ঘুমিয়ে পড়লে, না জেগে থাকলে, কিন্তু জেম ম্যানজারেসকে প্রতিরাতেই দেখতাম। কিছুক্ষণ কথা বলতাম, সব কিছু নিয়ে। তারপর সে অদৃশ্য হয়ে যেত। তার এই আসা-যাওয়ায় আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

সূর্য উঠে গেলে মনে হতো আমি দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছিলাম, কিন্তু রাত্তিরে এতটুকু সন্দেহ হতো না। মনে হতো জেম ম্যানজারেস আমার সঙ্গেই বোটে আছে। পঞ্চম দিন সেও ভোরের দিকে ঘুমোনোর চেষ্টা করছিল। চুপচাপ বিশ্রাম নিচ্ছিল। আরেকটা দাঁড়ের ওপর মাথা রেখে। হঠাৎ সমুদ্রে সে কি খুঁজতে লাগল। বলল — 'দেখো দেখো'। আমি দেখলাম। বোট থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে যেদিকে হাওয়া বইছে সেইদিকেই জ্বলছে আর নিভছে। একেবারে নির্ভুল জাহাজের আলো।

এখনও আমার ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় টানার শক্তি রয়েছে। আলোটা দেখে, নিজেকে চাঙা করে, দাঁড়টাকে শক্ত করে ধরে, জাহাজের দিকে এগোতে লাগলাম। জাহাজটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। এক মুহূর্তের জন্য আমি শুধু ওটার মাস্তুলের আলোই না, ভোরের প্রথম আলোয় জাহাজের চলমান ছায়াও দেখতে পেলাম।

হাওয়া প্রবল বাধা দিচ্ছে। তবুও ভীষণ জোরে আমি দাঁড় টানছি। অস্বাভাবিক শক্তি নিয়ে, চারদিন খাবার বা জল না খেয়েও। যেদিক থেকে হাওয়া ধাক্কা দিচ্ছে তাকে পাশ কাটিয়ে এক মিটারও বোট নিয়ে এগোতে পারছি না।

আলোগুলো অনেক দূরে সরে গেল, আমি ঘামতে লাগলাম। একেবারে ভেঙে পড়েছি। কুড়ি মিনিট পরে আর কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না। তারাগুলো নিভে যাচ্ছে। আকাশের গভীরে ধূসর আভা। সমুদ্রের মাঝখানে আমি নিঃসঙ্গ। দাঁড়গুলো ছেড়ে দিয়ে, হিমেল হাওয়ার কামড়ে, উন্মাদের মতন কয়েক মিনিট আর্তনাদ করতে লাগলাম।

যখন সূর্য উঠল, দাঁড়ের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছি। আমি একদম ফুরিয়ে গেছি। দেখতে পাচ্ছি উদ্ধারের কোনো আশা নেই। মরে যেতেই চাইছি। তখনই একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার মাথায় এলো। সেটাই আমার শক্তি জোগালো টিকে থাকার।

পঞ্চম দিনের সকালে আমি বোটের গতিপথ যেভাবে হোক পাল্টাতে লাগলাম। মনে হলো হাওয়া যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই পথেই চললে, আমি মানুষখেকো দ্বীপে গিয়ে পড়ব। মবিলে থাকার সময়ে নাম ভুলে গেছি, একটা ম্যাগাজিনে পড়েছি একটা ভাঙা জাহাজের নাবিককে মানুষখেকোরা কেমন করে গিলে খেয়েছিল। আরো চিন্তা করছিলাম, দু'বছর আগে বোগাটায় পড়েছিলাম 'দলত্যাগী নাবিক' বলে একটা বই। যুদ্ধের সময় এক জাহাজের নাবিক মাইনে ধাক্কা খাওয়ার পর কাছাকাছি এক দ্বীপে গিয়ে সাঁতরে উঠেছিল। সেখানে ২৪ ঘন্টা বুনো ফলমূল খেয়ে বেঁচেছিল। তারপর মানুষখেকোরা তাকে খুঁজে পেয়ে, ফুটন্ত জলের পাত্রে জ্যান্ত ফেলে রান্না করেছিল। সেই দ্বীপের কথা আমার মনের মধ্যে রয়ে গেছে। মানুষখেকোদের রাজত্বের কল্পনা বাদ দিয়ে আর কোনো তীরের কথা ভাবতেই পারছি না। একা এই সমুদ্রে পঞ্চম দিনে আমার ভয়ের চেহারাটা পাল্টে গেল। সমুদ্রকে এত ভয় পাচ্ছি না, যত না পাচ্ছি তীরের মাটিকে।

দুপুর নাগাদ বোটের ওপর বিশ্রাম করছি। সূর্যের তাপে ক্ষিধে তেষ্টায় ঝিমিয়ে পড়েছি। সময় সম্পর্কে, কোনদিকে চলেছি সে সম্পর্কে, কোনো অনুভূতিই নেই। নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্য উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। মনে হচ্ছে শরীর নাড়াতে পারছি না।

এই সেই সময়। সব কিছু ছাড়িয়ে সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। শিক্ষক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন, যখন বোটের সঙ্গে নিজেকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে। এই সেই মুহূর্ত যখন ক্ষিধেও পাচ্ছে না, তৃষ্ণাও নেই। ফাটা চামড়ায় সূর্যের আলোর কামড়েও কোনো সাড়া নেই। চিন্তা বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো অনুভূতিও নেই। কিন্তু আশা ছাড়া যাবে না। শেষ চেষ্টা হবে নিচের দড়িগুলোকে আল্‌গা করে নিয়ে, বোটের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলা। যুদ্ধের সময়ে এই রকম অনেক মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। পচে গেছে, পাখি ঠুকরেছে, তবুও বোটের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা।

নিজেকে দড়ি দিয়ে বাঁধার আগে, মনে হলো রাত্তির পর্যন্ত অপেক্ষা করার শক্তি

আমার এখনো আছে। বোটের নিচের দিকে গড়িয়ে এলাম। পা ছড়িয়ে দিলাম। ঘাড় পর্যন্ত নিচে রেখে কয়েক ঘন্টা পড়ে রইলাম। সূর্যের আলো, হাঁটুর ঘায়ে লেগে জ্বালা করছে। আবার যেন জেগে উঠেছি। এই ব্যথাই আমাকে নতুন করে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছে। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা জলে আমার শক্তি ফিরে আসছে। তখনই পেটে এক ভয়ঙ্কর মোচড় দিয়ে, একটানা গুড়গুড় শব্দ করে পায়খানা পেল। আটকাবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। অনেক অসুবিধে করে বসলাম। বেল্ট খুলে প্যান্ট নামিয়ে পাঁচদিনের মধ্যে এই প্রথম নিজেকে পরম তৃপ্তিতে খালাস করলাম। আর এই প্রথম মাছগুলো বেপরোয়াভাবে বোটের পাশে ধাক্কা দিতে লাগল। মোটা দড়ির জালের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে।

সাতটা শঙ্খচিল

কাছেই ঝকমকে মাছের চেহারাটা দেখে আবার ক্ষিদে পেয়ে গেল। এই প্রথম আমি সত্যিই বেপরোয়া। এই তো খাবার পেয়েছি। আমার ক্লান্তি ভুলে গেলাম। একটা দাঁড় ধরে, আমার শেষ শক্তি নিয়ে, নৌকোর পাশে লাফিয়ে ওঠা সুস্বাদু মাছগুলোর একটার মাথায়, স্থির লক্ষ্য নিয়ে, একটা বাড়ি লাগালাম। জানি না কতবার দাঁড় চালিয়েছি। মনে হলো, প্রত্যেকটা মারই ঠিক জায়গায় লেগেছে। কিন্তু বৃথাই অপেক্ষা আমার শিকারের জন্য। মাছেদের মহাভোজ চলেছে। আর একটা হাঙর পেটটা তুলে, জলের ঘূর্ণির মধ্যে, তার নিজের সুস্বাদু ভাগটা বুঝে নিচ্ছে।

হাঙরটার উপস্থিতি আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট করল। বোটের পাশে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়লাম। কয়েক মুহূর্ত পর, অবাক হয়ে দেখি, বোটের ওপর সাতটা শঙ্খচিল উড়ে বেড়াচ্ছে।

সমুদ্রে একা একজন ক্ষুধার্ত নাবিকের কাছে প্রত্যাশার বার্তা। সাধারণভাবে সমুদ্র যাত্রায় জাহাজ বন্দর ছাড়লে দু'দিন পর্যন্ত বড়জোর দেখা যাবে, একঝাঁক শঙ্খচিল জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। এই সাতটা শঙ্খচিলকে দেখে মনে হচ্ছে সামনেই তীরের মাটি!

যদি শক্তি থাকত আমি দাঁড় বাইতে শুরু করতাম। কিন্তু ভীষণ দুর্বল। পায়ের ওপর ভর করে দু'দণ্ড দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই। আমি নিশ্চিত, তীর থেকে আমি দু'দিনের মতন দূরত্বে আছি। হাতের পাতায় ভরে আর একটু সমুদ্রের জল খেলাম। আবার শুয়ে পড়লাম। মুখ তুলে, সূর্যের আলো যাতে ফুসফুসে না লাগে। শার্টটা দিয়ে মুখও ঢাকলাম। যাতে আস্তে আস্তে সমুদ্রের একটা নির্দিষ্ট কোণে উড়ে চলা শঙ্খচিলগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে পারি। পঞ্চম দিনের এখন দুপুর একটা।

আমি দেখিনি কখন ওটা এসেছে। শুয়েছিলাম যখন পাঁচটা বাজে। নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। হাঙর আসার আগেই বোটের মাঝখানে বসতে হবে। ঠিক তখন

আমার হাতের মুঠোর মতন ছোট একটা শঙ্খচিল, মাথার ওপর ঘুরতে ঘুরতে, আমার উল্টোদিকে বোটের শেষপ্রান্তে বসে পড়ল।

আমার জিভে ঠাণ্ডা জল এসে গেল। ওটাকে ধরার জন্য কিছুই নেই। শুধু আমার হাত আর ধূর্ত বুদ্ধি ছাড়া, খিদের জ্বালায় যা আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে। অন্য শঙ্খচিলেরা চলে গেছে। শুধু এই বাদামী ঝকঝকে ডানা ছোট্টটা বোটের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি একদম চুপচাপ। কাঁধের কাছে মনে হলো সময় মেনে চলা হাঙরের ধারালো ডানা। ঠিক পাঁচটায় এসে গেছে। কিন্তু আমি একটা ঝুঁকি নেবো। পাখিটার দিকে তাকাচ্ছি না। আমার মাথা নাড়ায় যাতে ও ভয় না পেয়ে যায়। আমার শরীরের কাছে উড়ে এসেছে। তারপরেই শূন্যে উড়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। কিন্তু আশা ছাড়লাম না। আমি ক্ষুধার্ত। যদি শান্ত হয়ে বসে থাকি পাখিটা আমার হাতের কাছে আসবেই।

মনে হচ্ছে আধ ঘন্টা অপেক্ষা করলাম। পাখিটা এলো। আবার চলে গেল। বার বার আসছে, যাচ্ছে। একবার মনে হলো মাথার ওপর একটা হাঙরের ডানার ঝাপটা। হাঙররা মাছকে টুকরো টুকরো করছে। কিন্তু ভয়ের চেয়ে আমার খাওয়ার জ্বালা বেশি। পাখিটা বোটের পাশে আবার লাফিয়ে নামলো। আমার সমুদ্রের পঞ্চম দিনের সন্ধ্যা। আর এই পাঁচদিন কিছুই খাইনি। আমার সমস্ত আবেগ সত্ত্বেও, বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের ধুক্‌ধুকুনি নিয়েই শান্ত হয়ে আছি মরা মানুষের মতন। অপেক্ষা করছি কখন শঙ্খচিলটা আরো কাছে আসবে।

বোটের ওপর পিঠ দিয়ে বসে আছি, থাইয়ের ওপর হাত দুটো রেখে, আধ ঘন্টা ধরে একবারও চোখ বুজিনি। আকাশ জ্বল জ্বল করছে, চোখে জ্বালা ধরাচ্ছে। এই উত্তেজনার মুহূর্তে আমি চোখ বন্ধ করতে পারছি না। পাখিটা আমার জুতো ঠোকরাতে লাগল।

আরো আধ ঘন্টা উত্তেজনার পর আমার পায়ের ওপর ওটা বসল। আমার প্যান্ট ঠোকরাচ্ছে। যখন আমার হাঁটুতে ওর তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাচ্ছিল, আমি আহত হাঁটুর ব্যথায় চিৎকার করে উঠতাম। কিন্তু সহ্য করে গেলাম। তারপর পাখিটা আমার ডান থাইতে এসে বসল। আমার হাত থেকে পাঁচ-ছ সেন্টিমিটার দূরে। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ। দারুণ উত্তেজনায় আস্তে আস্তে, যাতে দেখতে না পায় হাত বাড়াতে লাগলাম ওর দিকে।

www.boiRboi.blogspot.com

৭

ক্ষুধার্ত মানুষের বেপরোয়া চেষ্টা

কোনো গ্রামের মাঠে শুয়ে পড়ে, কেউ একটা শঙ্খচিল ধরার চেষ্টা করে সারা জীবন কেটে গেলেও, সফল হওয়া যাবে না। কিন্তু তীর থেকে কয়েক শ' মাইল দূরে ব্যাপারটা অন্যরকম। মাটিতে শঙ্খচিলের আত্মরক্ষা করার ইন্দ্রিয় খুবই উঁচু মানের। কিন্তু সমুদ্রে তারা খোশ মেজাজী।

আমি এমনভাবে শুয়েছিলাম যে পাখিটা খেলার ছলে আমার থাইয়ের ওপর উঠে এল। বোধ হয় ভাবছিল আমি মরে গেছি। আমার প্যান্ট ঠোকরাচ্ছিল কিন্তু লাগছিল না। আমি হাত বাড়াতেই লাগলাম। হঠাৎ শেষ মুহূর্তে পাখিটা বুঝল বিপদে পড়েছে, আর তখনই ওড়ার চেষ্টা করল। আমি ওর ডানাটা খামচে ধরলাম। একেবারে বোটের মাঝখানে নিয়ে এলাম। এবার ওটাকে গিলে খাবো।

একবার আমি ডেকের ওপর জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলা একটা শঙ্খচিল রাইফেল দিয়ে মারতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ডেস্ট্রয়ারের গোলন্দাজ অফিসার, — একজন অভিজ্ঞ নাবিক, আমায় বলেছিল — "হতভাগার মতো কাজ করো না। একজন নাবিকের কাছে শঙ্খচিল জমির নিশানা। কখনই ওদের মারা উচিত নয়।" হাতে পাখিটাকে নিয়ে টুকরো করে ছিঁড়ে মেরে ফেলার সময় সেই ঘটনাটার কথা মনে পড়ল — সেই গোলন্দাজ অফিসারের কথাগুলো। যদিও পাঁচদিন খাইনি, তবুও সেই কথাগুলোই আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। যেন নতুন করে আবার শুনছি। কিন্তু পেটের ক্ষিধে যে কোনো কিছুর থেকেই তীব্র। আমি পাখিটাকে শক্ত করে ধরে মুরগীর মতন ঘাড়টাকে মটকাবার চেষ্টা করলাম।

ব্যাপারটা ভীষণ সূক্ষ্ম। প্রথম মোচড়ে ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেল। আর এক মোচড়ে ওর টাটকা ঈষদুষ্ণ রক্ত আমার হাতের আঙুল দিয়ে ঝরতে লাগল। ভীষণ খারাপ লাগছে। ওটাকে দেখে মনে হচ্ছে এক খুনের শিকার। মাথাটা তখনো নড়ছে — ঝটপট করছে, শরীর থেকে ঝুলছে, আমার হাতের মধ্যে দপদপ করছে।

এই খুনের রক্তই মাছগুলোকে চাঙ্গা করে তুলল। একটা হাঙরের ঝকমকে সাদা পেট বোটের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। হাঙর রক্তের গন্ধে পাগল হলে ইস্পাতের পাতও কামড়ে ফেলবে। ওদের দাঁতগুলো তলার দিকে, খাবার ধরতে তাই ওরা উল্টিয়ে যায়। যেহেতু প্রচণ্ড লোভী এবং চোখে দেখে কম, পেটটা একবার ওল্টালে সামনে যা পাবে তাই ধরেই টান মারবে। মনে হলো একটা হাঙর বোটটাকে আক্রমণ

করার চেষ্টা করছে। ভয় পেয়ে গিয়ে পাখিটার মাথাটা ওটার দিকে ছুঁড়ে দিলাম। বোটের কয়েক সেন্টিমিটার দূরেই বিশাল জন্তুগুলোর মহারণ শুরু হয়ে গেল। ডিমের থেকেও ছোট্ট পাখিটার মাথাটার টুকরোটা নিয়ে।

পাখিটা ভীষণ হালকা আর হাড়গুলো এতই নরম যে আঙুল দিয়েই ভেঙে ফেলা যায়। পালকগুলো ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। সাদা নরম চামড়ায় লেগে আছে। রক্ত মাখা ডানার সঙ্গে মাংসও বেরিয়ে আসছে। আঙুল ভর্তি কালো কুৎসিত কি একটা তরল জিনিস গলে গলে পড়ছে, অসহ্য লাগছে।

এটা বলা সহজ যে পাঁচদিন না-খাওয়ার পর যা ইচ্ছে খাওয়া যায়। কিন্তু অভুক্ত থাকলেও গরম রক্তমাখা ডানাগুলোতে কাঁচা মাছ আর জন্তুর ঘায়ের মতো কড়া গন্ধে বমি আসছে। আমি সতর্কভাবে ঠিকঠাক ডানাগুলো ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু চামড়াটা যে এত নরম সেটা খেয়ালে নেই। ডানাগুলো খুলে আসতেই ওটা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল আমার হাতের মধ্যে। বোটের মাঝখানে গিয়ে ধোওয়ার চেষ্টা করলাম। একটানে ওটাকে দু'টুকরো করলাম। গোলাপী পাকস্থলী, আর নীল শিরাগুলো আমার ক্ষিধে বাড়িয়ে দিল। ঠ্যাঙের একখণ্ড মুখে পুরলাম। গিলতে পারলাম না। অসম্ভব ব্যাপার। যেন ব্যাঙ চিবোচ্ছি। ভয়ঙ্কর ঘেন্নায় মাংসের খণ্ডটা থুঃ থুঃ করে ফেলে দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম, রক্ত মাখা ডানা আর হাড়গুলো হাতে নিয়ে।

মনে হলো যা খেতে পারব না, তা টোপ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু মাছ ধরার কোনো সাজসরঞ্জামই আমার নেই। একটা পিন। একখণ্ড তার থাকলেও হতো। শুধু চাবি, ঘড়ি, আংটি আর তিনটে মবিলের দোকানের ব্যবসায়িক কার্ড ছাড়া কিছুই নেই।

বেল্টটার কথা ভাবলাম। ওটার বকলেসটাকে বঁড়শি হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। মাছগুলো বোটের চারপাশে রক্তের গন্ধে পাগল হয়ে ঘোরাফেরা করছে। পুরো অন্ধকার হয়ে গেলে আমি শঙ্খচিলের বাকি অংশগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। দাঁড়টাকে সরাতে গিয়ে বুঝলাম, যেগুলো আমি খেতে পারিনি, মাছেরা সেই হাড়গুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে।

ক্লান্তি আর আশা ভঙ্গে মনে হলো এই রাত্তিরেই মারা যাব। শুরুতেই একটা দমকা হওয়া এল। বোটটা ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি শক্ত করে দড়ির সঙ্গে নিজেকে আটকে আত্মরক্ষার জন্য আগাম ব্যবস্থা নিতে ভুলে গেলাম। ক্লান্ত হয়ে, বোটের নিচের দিকে মাথা আর পা জলের থেকে একটু ওপরে রেখে শুয়ে রইলাম।

মাঝরাতে একটু পরিবর্তন। চাঁদ উঠল। দুর্ঘটনার পর এই প্রথম। ধবধবে নীল রাত্তিরের নিচে সমুদ্রের ওপরটা মায়াবী হয়ে উঠল। সেই রাত্তিরে জেম ম্যানজারেস এল না। আমি একা। আশাহীন, ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি।

যতবার আমার উদ্যম ভেঙে পড়ছে, ততবারই কিছু ঘটছে নতুন করে আশা জাগাতে। সেই রাত্তিরে ঢেউয়ের ওপর চাঁদের আলোয় তাই হলো। সমুদ্রে ভাঙা

ভাঙা ঢেউ আর প্রত্যেক ঢেউয়ের মধ্যেই আমি যেন জাহাজের আলো দেখতে পাচ্ছি। দু'রাত্তির আগের ভাবনা ছিল, যে জাহাজ আমাকে উদ্ধার করবে। অবশ্য সে আশা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু ছ'দিনের দিন রাত্তিরে আমি আবার চাঁদের আলোয় পাগলের মতন দিগন্ত খুঁজে চললাম। সেই প্রথম রাত্তিরের মতন তন্নতন্ন করে, অনেক আশা নিয়ে। আজকেও যদি সেই অবস্থা হয়, আমি আশা ভঙ্গেই মারা যাবো। এখন বুঝতে পারছি, আমার বোট যে পথে চলেছে, সেদিকে কোনো জাহাজ আসে না।

আমি এক মৃত মানুষ

পরের দিন ভোরবেলাটা কিছুই মনে নেই। অসংলগ্নভাবে শুধু মনে হচ্ছে সারা সকাল বোটের নিচে শুয়েছিলাম। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে। বাড়ির লোকের কথা ভাবছিলাম। পরে জেনেছিলাম তারা ঠিক কি করছে। অবাক হইনি শুনে। একা সমুদ্রে দু'দিনের দিন আমি ভাবছিলাম এ ধরনের ব্যাপারটাই ঘটছে। বাড়ির লোকদের হারিয়ে যাওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে। প্লেনও আর উড়ে এল না। তার মানে দাঁড়াচ্ছে ওরা আমাকে খোঁজা ছেড়ে দিয়েছে। মৃত বলে ঘোষণা করেছে।

এইরকম সবকিছু হয়, কিন্তু তারও একটা সীমা থাকে। আমি প্রতি মুহূর্তে কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি। বেঁচে থাকার পথ খুঁজছি। কিছু একটা ধরে, আশা জাগিয়ে রাখার কোনো একটা কারণ, সেটা যত সামান্যই হোক ছ'দিনের মাথায় সব কিছুর আশা ছেড়ে দিলাম। আমি বোটের ওপর একটা মড়া মানুষ।

বিকেলে, ভাবতে লাগলাম কখন পাঁচটা বাজবে, হাঙররাও আসবে। বোটের পাশ থেকে সরে বসলাম। দু'বছর আগে কারটাগেনায় হাঙরে খাওয়া একজন মানুষের মৃতদেহ দেখেছিলাম। ওভাবে মরতে চাই না। ভয়ঙ্কর পেটুক জন্তুগুলোর কবলে টুকরো টুকরো হতে।

প্রায় পাঁচটা। হাঙরগুলো এসে গেছে। চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। বোটের নিচের একটা দড়ি থেকে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছিলাম। বিকেলটা ঠাণ্ডা। সমুদ্রও শান্ত। শরীরে একটু বেশি শক্তি অনুভব করছি। গতকাল থেকে যে শঙ্খচিল দেখছি, ওরাই আমার নতুন করে বাঁচার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলেছে।

এই মুহূর্তে আমি যা পাব তাই খেতে পারি। খিদে আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। কিন্তু একটুও নড়াচড়া না করার ফলে আমার শুকনোকাঠ গলার আর চোয়ালের ব্যথা আরো খারাপ। আমার দরকার কিছু চিবোনো। জুতোর তলায় রবারের সোলটা ছিঁড়তে গেলাম, পারলামনা। তখন মনে পড়ল দোকানের ব্যবসায়িক কার্ডগুলো।

প্যান্টের একটা পকেটে রয়েছে। ভিজে গিয়ে প্রায় ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। ওগুলো ছিঁড়ে ফেল্লাম, মুখে পুরে চিবোতে লাগলাম। এটা একটা আশ্চর্য কাজ করল। গলায় একটু আরাম পাচ্ছি। মুখেও জল এসে গেছে। ওগুলো আস্তে আস্তে চিবোতে

লাগলাম চুইংগামের মতো। প্রথম কামড়ে চোয়ালে ব্যাথা করল। খেতে খেতে মনে হচ্ছিল এই কার্ডগুলো মেরীর সঙ্গে বাজার করার সময় থেকে রেখে দিয়েছিলাম কোনো কারণ ছাড়াই। বেশ শক্ত লাগছে নিজেকে, একটু আশাবাদীও। মনে হচ্ছিল চোয়ালের ব্যথা কমানোর জন্য আমি অনন্তকাল ধরে ওগুলো চিবিয়ে যাব। ভীষণ ক্ষতি হয়ে যেত এগুলো ফেলে দিলে। বুঝতে পারছিলাম দলা পাকানো কার্ডগুলো সোজা আমার পেটের মধ্যে চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি বেঁচে যাব হাঙররা আমায় শেষ করতে পারবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

জুতো খেতে কেমন ?

কার্ডগুলো চিবিয়ে যে আরাম পেলাম, তাতে আমার খাওয়ার চিন্তাই বেড়ে গেল। অন্য কি খাবার পাওয়া যায়। ছুরি থাকলে জুতোর থেকে রবারের সোল কেটে খণ্ড খণ্ড করে চিবোতাম। ওটাই আছে হাতের কাছে। চাবি দিয়ে পরিষ্কার, সাদা সোলটা খুলে ফেলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু একখণ্ডও ভাঙতে পারলাম না। শক্ত করে আটকানো রয়েছে।

উন্মত্তের মতো আমার বেল্টটা কামড়াতে লাগলাম যতক্ষণ না দাঁত ব্যথ্যা করতে লাগল। এক টুকরোও মুখে নিতে পারলাম না। আমাকে নিশ্চয়ই এখন দানবের মতো লাগছে — জুতো বেল্ট শার্ট কামড়াচ্ছি, চেষ্টা করছি ছিঁড়তে। সন্ধেবেলা ঘামে ভেজা জামা প্যান্ট খুলে শুধু হাফ প্যান্ট পরে রইলাম। জানি না কার্ডগুলো চিবোনোর ফলে কিনা। তৎক্ষণাৎ ঘুম এসে গেল। আমি বোটের অসুবিধাগুলোর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। ছ'রাত্রি একটানা সতর্ক থাকতে থাকতে একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছি। বোধ হয় সেই কারণেই কয়েক ঘন্টা গভীর ঘুমে ঢুলে পড়লাম। কোনো কোনো সময় ঢেউয়ের ধাক্কায় উঠে পড়ছি। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠছি। যদি ঢেউয়ের ধাক্কায় জলে পড়ে যাই। আবার কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ছি।

এভাবেই আবার উঠে বসলাম। সমুদ্রে সপ্তম দিন। জানি না, কেন নিশ্চিত মনে হচ্ছে যে এটাই আমার শেষ দিন নয়। সমুদ্র শান্ত, দিনটা মেঘলা। আটটার সময় সূর্য দেখা গেল। গতরাতে ভালো ঘুমের পর আবার আশান্বিত লাগছে। ঝুঁকে পড়া বিশাল নিচু আকাশের মধ্যে সাতটা শঙ্খচিল উড়ছে ঠিক বোটের ওপরে।

দুদিন আগে ওদের দেখে উল্লসিত হয়েছিলাম। কিন্তু তৃতীয়বার দেখে আবার ভয় পেয়ে গেলাম। হতাশায় মনে হলো ওরা হারিয়ে যাওয়া সাতটা শঙ্খচিল। সব নাবিকরাই জানে, শঙ্খচিলেরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে সমুদ্রে হারিয়ে যায়। দিনের পর দিন ওড়ে, যতক্ষণ না একটা জাহাজ দেখতে পায়। জাহাজই ওদের দেখিয়ে দেয় কোন দিকে বন্দর। তিনদিন ধরে যে শঙ্খচিলদের দেখছি। এরা বোধ হয় একই দল। প্রতিদিন দেখছি। ওরা সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। তাঁর মানে আমার বোট, পাড়ের থেকে ক্রমশই দূরে আরও দূরে চলে যাচ্ছে।

www.BanglaBoi.blogspot.com

৮

একটা মাছের জন্য হাঙরের সঙ্গে লড়াই

সাত দিন ধরে, পাড়ের দিকে না এগিয়ে সমুদ্রের দিকে সরে যাচ্ছি — এই চিন্তা, আমার লড়াই করার শক্তি একেবারেই ভেঙে দিল। কিন্তু মৃত্যু কাছে এলে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি আরো জোরদার হয়। অনেকগুলো কারণে এই দিনটা আগের দিনগুলোর থেকে আলাদা। সমুদ্র কালো, আর শান্ত। সূর্যের আলোও উষ্ণ আর পরিষ্কার। শরীরকে যেন আলিঙ্গন করছে। মৃদুমন্দ হাওয়া, বোটটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সূর্যের তাপে পোড়া শরীরটাও একটু যেন ভালো লাগছে।

মাছগুলোও যেন অন্যরকম। সকাল থেকেই ওরা বোটের পাশাপাশি চলেছে, ওপরে সাঁতার কাটছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি — নীল, ধুসর, বাদামী, লাল মাছ — যত রঙ আছে, যত আকৃতি আছে, সব ধরনের। মনে হচ্ছে যেন বোটটা একটা এ্যাকোরিয়ামের মধ্যে ভেসে চলেছে।

জানি না সাতদিন অভুক্ত অবস্থায় সমুদ্রে পড়ে থাকলে এইভাবেই মানুষ বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে কিনা। মনে হচ্ছে তাই-ই। আগের দিনের আশাভঙ্গ একটা আবেগহীন করুণ নিরাশক্তিতে ভরে গেছে। এখন সব কিছুই অন্যরকম। সমুদ্র বা আকাশ আমার শত্রুতা করছে না। যে মাছগুলো আমার যাত্রা-সঙ্গী ওরাই আমার বন্ধু। আমার সাত দিনের পুরনো সহচর।

এই সকালে আবার চিন্তা করছি, আমার লক্ষ্যে আমি পৌঁছবোই। যদিও নিশ্চিত, বোটটা যেখানে এসে পৌঁছেছে, এই এলাকায় কোনো জাহাজ নেই। এমন কি শঙ্খচিলেরাও দিশাহারা।

তবু মনে হচ্ছে সাত দিন হারিয়ে গিয়ে সমুদ্রে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অভ্যস্ত হয়ে গেছি জীবনের সমস্ত আশংকায়। বেঁচে থাকার জন্য বেশি চিন্তাও করতে হচ্ছে না। এক সপ্তাহ প্রবল ঝড় আর ঢেউ পার করে দিয়েছি। সারা জীবন কি এই বোটেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়? মাছগুলো ওপরে সাঁতার কাটছে। সমুদ্র পরিষ্কার আর শান্ত। চারপাশে এত সুন্দর লোভ জাগানো মাছ, মনে হচ্ছে হাত দিয়েই ওদের ধরতে পারি। কোনো হাঙর চোখে পড়ছে না। গোল উজ্জ্বল নীল রঙের ২০ সে.মি. এর মতো লম্বা একটা মাছ ধরার জন্য জলে হাত বাড়ালাম। মনে হলো জলে যেন একটা পাথর ছুঁড়ে মেরেছি। জলের মধ্যে আলোড়ন তুলে সব কটা মাছ মুহূর্তে পালিয়ে গেল। আবার আস্তে আস্তে ওপরে ভেসে উঠল। হাত দিয়ে মাছ ধরতে হলে আরও দক্ষ হতে হবে। জলের নিচে হাতের শক্তিও কমে যায়, ক্ষিপ্রতাও থাকে না। ঝাঁকের মধ্যে একটা মাছকে বেছে নিলাম। ধরার চেষ্টা করলাম। ধরেও ফেললাম।

কিন্তু অকল্পনীয় ক্ষিপ্রগতিতে আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গেল। আমি ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাড়াহুড়ো না করে চেষ্টা আবার চালাতে লাগলাম। ভাবিনি যে ওখানে হাঙরও থাকতে পারে। কনুই পর্যন্ত ডোবানোর পর ভাবলাম। একটা মোক্ষম কামড়েই হাতটা খেয়ে নিতে পারে। সকাল দশটা পর্যন্ত ওই মাছ ধরার চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু একেবারেই ব্যর্থ। মাছগুলো আমার আঙুল ঠোকরাচ্ছিল। প্রথমে আস্তে আস্তে, যেমন শিকার ধরার সময় করে। তারপর জোরে ঠোকরাতে লাগল। একটা স্বচ্ছ রূপোলি মাছ, দেড় ফুটের মত লম্বা ছোট ছোট ধারালো দাঁত, আমার বুড়ো আঙুলের চামড়া কেটে নিল। পরে বুঝলাম অন্য মাছগুলোর ঠোকরানোও কম মারাত্মক নয়। আমার সব কটা আঙুলই কেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

বোটের ওপর হাঙর

আমার আঙুলের রক্তের জন্য কি না জানি না, মুহূর্তের মধ্যে হাঙরদের হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল বোটের চারপাশে। এত হাঙর কোনোদিন দেখিনি। এমন পেটুকও ওদের কখনো দেখিনি। ডলফিনদের মতো লাফাচ্ছে, মাছেদের তাড়া করছে আর গিলছে। ঘাবড়ে গিয়ে আমি বোটের মাঝখানে বসে বসে এই ধ্বংস তাণ্ডব দেখতে লাগলাম।

বুঝতেই পারিনি, কখন একটা হাঙর জলের ওপরে উঠে এসে, এমন ভয়ঙ্কর ভাবে লেজের ঝাপটা মারল যে বোটটা দারুণ কেঁপে উঠে, ঝলমলে ফেনার তলায় ডুবে গেল। বিশাল এক ঢেউ ভেঙে পড়ল বোটের ওপর। তার ওপর এক ধাতব ঝলকানি। যন্ত্রের মতন একটা দাঁড় ধরে আমি ওটাকে এক মারমুখি বাড়ি লাগালাম। এর বিশাল ডানা দেখতে পেলাম। পরে বুঝলাম কী হয়েছে। হাঙরের তাড়া খেয়ে আধ মিটার লম্বা একটা দারুণ সবুজ রঙের মাছ আমার বোটের ওপর লাফিয়ে উঠেছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি এবার সেটার মাথায় এক ঘা লাগালাম।

এই ধরনের বোটের মধ্যে মাছ মারা খুব সোজা নয়। প্রতিটা বাড়ির সঙ্গে বোটটা দুলতে লাগল। উল্টেও যেতে পারত। বিপজ্জনক পরিস্থিতি। সমস্ত শক্তি আর বুদ্ধি কাজে লাগালাম। যদি অন্ধের মতন মার দিয়ে চলি, তবে বোটটা উল্টে যাবে। ক্ষুধার্ত হাঙরে ভর্তি সমুদ্রে পড়ে যাবো। আর যদি লক্ষ্যে ঠিক না থাকি, আমার শিকার পালিয়ে যাবে, না হলে চার পাউণ্ড টাটকা মাছ পাবো — সাত দিনের ক্ষিধে দূর হবে। বোটের ওপরে বসে দ্বিতীয় বাড়ি লাগালাম। কাঠের দাঁড়টা মাছের মাথায় লেগেছে। বোটটা কেঁপে উঠল। নিচ দিয়ে হাঙর চলে যাচ্ছে। আমি বোটের কোণে নিজেকে সামলে নিলাম। বোটটা সোজা হয়েছে, কিন্তু মাছটা এখনো জ্যান্ত।

মাছ এমনিতে যত লাফায়, যন্ত্রণায় তার থেকেও বেশি লাফাতে পারে। বুঝলাম তৃতীয় বাড়িটা যদি ঠিকমতো না হয়, তাহলে একেবারেই শিকার হাতছাড়া হবে। মাছটার দিকে একটু এগিয়ে, বোটের ওপর বসে, মনে হলো ওকে ধরে ফেলাই বেশি

সুবিধে। দরকার হলে দু'পা দিয়ে চেপে ধরব — দু'হাঁটুর ফাঁকে, অথবা দাঁত দিয়ে কামড়ে। বোটের মেঝেতে জায়গা করে নিলাম। যেন ভুল না হয়, এই বারের মারটার ওপরে আমার জীবন নির্ভর করছে। সব শক্তি দিয়ে দাঁড় চালালাম। মাছটার নড়াচড়া বন্ধ হলো। বোটের মধ্যের জল লাল হয়ে গেল গাঢ় রক্তে। গন্ধ পাচ্ছি রক্তের। হাঙরেরাও পেয়েছে। হাতের মুঠোয় চার পাউণ্ড মাছ নিয়ে ভয়ংকর ভয় পেয়ে গেলাম। রক্তের গন্ধে পাগল হাঙরেরাও বোটের নিচে ধাক্কা মারছে। বোট কেঁপে উঠল। যে কোনো মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে। প্রত্যেকটা হাঙরের মুখে তিন সারি ইস্পাতের মতন দাঁত। তার ফাঁকে আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

কিন্তু ক্ষিধের জ্বালা সব কিছু ছাড়িয়ে যায়। মাছটাকে চেপে ধরলাম দু'পায়ের ফাঁকে। হাঙররা যতবার ধাক্কা দিচ্ছে, কাঁপতে কাঁপতে ততবার বোটটাকে সামলাবার চেষ্টা করছি। কয়েক মিনিট এই চললো। বোটটা যখন শান্ত হলো, আমি ভেতরের রক্ত ভরা জল বাইরে ফেলে দিলাম। জল পরিষ্কার হয়ে গেলে, জন্তুগুলো শান্ত হয়ে এলো। কিন্তু আমায় সতর্ক থাকতে হচ্ছে। ভয়ংকর বিশাল হাঙরের এতবড় ডানা কোনোদিন দেখিনি। জলের এক মিটারেরও ওপরে উঁকি দিচ্ছে। হাঙরটা শান্তভাবে সাঁতরাচ্ছে, কিন্তু ও যদি একবার রক্তের গন্ধ পায়, এমন ধাক্কা দেবে যে, বোট উল্টে যাবে। বেশ সতর্ক হয়ে মাছটাকে টুকরো করার চেষ্টা করলাম। আধ মিটার লম্বা এই প্রাণীটা শক্ত আঁশে ঢাকা। ছাড়াবার চেষ্টা করতে মনে হলো যেন আঁশগুলো মাছের শরীরে বর্মের মতো গেঁথে আছে। কোনো ধারালো যন্ত্র নেই। চাবি দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিচ্ছু হলো না। এরকম মাছ কোনোদিন দেখিনি। গাঢ় সবুজ রঙ আর মোটা আঁশ। ছোটবেলা থেকে সবুজ রঙ দেখলে আমার মনে হয় বিষ। সবুজ রঙের সঙ্গে এসে যায় বিষের অনুষঙ্গ। আমার পেট এক কামড় টাটকা মাছের জন্য যন্ত্রণায় কামড়াচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, এই অদ্ভুত প্রাণীটা সত্যি বিষাক্ত কি না!

বেচারা শরীর

যখন খাওয়ার কোনোই আশা নেই, তখন ক্ষিধে সহ্য করা যায়। কিন্তু হাতে চকচকে সবুজ মাছটা যখন চাবি দিয়ে কাটবার চেষ্টা করছি ক্ষিধে তখন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। কয়েক মিনিটেই বুঝলাম, যদি এই শিকারটাকে খেতে হয়, আমাকে আরো কড়া কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। দাঁড়িয়ে উঠলাম। ওটাকে লেজের দিক থেকে ধরে দাঁড়টা ঢুকিয়ে দিলাম। একটা কানকোর মধ্যে। মাছটা তখনো মরেনি। মাথায় আর একটা বাড়ি দিলাম। কানকো ঢেকে রাখে যে শক্ত জায়গাটা সেটাকেই ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। আঙুল দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল। এটা মাছের না আমার নিজের, জানি না। হাত কেটে কুটে গেছে, আঙুলের মাথার ছাল উঠে গেছে। রক্তের গন্ধ আবার হাঙরদের ক্ষিধে বাড়িয়ে দিল। অবিশ্বাস্য হলেও, এই ক্ষুধার্ত জন্তুগুলোকে আর রক্ত মাখা মাছটাকে দেখে, বিরক্তিতে ভাবলাম ওটাকে হাঙরদের

দিকেই ছুঁড়ে দেব। যেমন শঙ্খচিলটাকে দিয়েছিলাম। আমি হতাশ আর অসহায়, এই শক্ত মাছ কাটাও যায় না।

মনোযোগ দিয়ে মাছটার শরীরের নরম জায়গাটা খুঁজতে লাগলাম। দু'টো কানকোর মাঝখানে আঙুল ডুকিয়ে ভেতরের অংশটাকে টেনে বার করতে চেষ্টা করলাম। মাছের ভেতরটা নরম, শক্ত, কোনো কিছু নেই। লোকে বলে হাঙরের লেজে জোরে বাড়ি দিলে তার পেট, পাকস্থলী সব কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। আমি কারটাগেনায় দেখেছি, হাঙরদের লেজ বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মুখ দিয়ে বড় বড় দলা দলা কালো নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে আসছে।

ভাগ্যবশত মাছটার পেটের মধ্যেটা হাঙরের মতই নরম। আঙুল দিয়ে টেনে বার করতে বেশি সময় লাগল না। মাছটি স্ত্রী জাতীয়। পেটের মধ্যে একগুচ্ছ ডিম। পরিষ্কার করে নিয়ে, প্রথম কামড়টা লাগালাম। আঁশ ভেদ করতে পারলাম না। দ্বিতীয়বার মরীয়া হয়ে আরো জোরে কামড়ালাম। মুখ ব্যথা করে উঠল। তারপর সত্যিই পারলাম। ঠাণ্ডা শক্ত মাছ টুকরো করে ফেলে মুখে ভরে, চিবোতে লাগলাম।

চিবোতে খুব বাজে লাগছে। কাঁচা মাছের গন্ধ এমনিতেই গা গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু এটার গন্ধে আরো ঘেন্না করছে। খানিকটা কাঁচা পামের মতো, তেল-তেল কিন্তু অ-খাদ্য। আমি কল্পনা করতে পারি না কেউ কাঁচা মাছ খাচ্ছে। কিন্তু মুখের মধ্যে প্রথম চিবোনোর পর, সাতদিন পরে সত্যিই মনে হচ্ছে আমি কিছু খাচ্ছি।

এক খণ্ড খেয়ে বেশ ভালো লাগছে। আরেক কামড় দিয়ে আবার চিবোলাম। একটু আগেও মনে হচ্ছিল একটা পুরো হাঙরই খেয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু দু'কামড়ের পর মনে হচ্ছে পেট ভর্তি হয়ে গেছে। এক মুহূর্তে সাত দিনের ভয়ংকর ক্ষিধে মিটে গেছে। এখন আমি বেশ শক্ত—একেবারে প্রথম দিনের মতো। আগে জানতাম না কাঁচা মাছ জল তেষ্টাও কমিয়ে দেয়। এখন দেখলাম মাছটা আমার ক্ষিধে-তেষ্টা দুই-ই মিটিয়েছে। আমি এখন বেশ চাঙ্গা এবং আশাবাদী। এখন খাবারও জমা রইল অনেকদিনের মতো। ঐ আধ মিটার লম্বা মাছটার শুধুতো দু'কামড় খেয়েছি।

মাছটাকে শার্ট দিয়ে মুড়ে বোটের নিচে রেখে দিলাম, যাতে তাজা থাকে। প্রথমে একটু ধুয়ে নিতে হবে। অন্যমনস্ক হয়েই লেজটা ধরে ওটাকে একটু বোটের পাশে নিয়েছি। আঁশ গড়িয়ে রক্ত ঝরছে, ধুয়ে ফেলতে হবে। কিছু না ভেবেই ওটাকে জলে ডুবিয়েছি, আর তখনই একটা হাঙরের ভয়ংকর চোয়ালের ধাক্কা মালুম হলো। যত শক্তি আছে তাই দিয়ে মাছটার লেজটা ধরে রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হাঙরটার বুকের ধাক্কা আমাকে উল্টিয়ে দিল। এক কোণে পড়ে গেলাম। কিন্তু খাবার ছাড়িনি। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকলাম। সেই মুহূর্তে মাথায় আসেনি যে হাঙরটা আর একটা কামড় দিয়ে কাঁধ থেকে আমার হাতটাই খুলে নিতে পারে। আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে হাত তুলে আছি। কিন্তু হাত ফাঁকা। হাঙরটা আমার শিকার নিয়ে পালিয়েছে, রাগে, ভয়ংকর হতাশায় একটা দাঁড় তুলে নিয়ে বোটের পাশ দিয়ে চলন্ত হাঙরটার মাথায় জোর বাড়ি লাগালাম। জন্তুটা লাফিয়ে উঠে, রাগে শরীরের এক মোচড় দিয়ে, নির্ভুল বন্য কামড়ে দাঁড়টাকে টুকরো করে অর্ধেকটা খেয়ে ফেলল।

www.boiRboi.blogspot.com

৯

সমুদ্রের রঙ বদল

হাঙরটার বিরুদ্ধে আমার প্রতিশোধ মেটাতে আমি রাগে ভাঙা দাঁড়টা দিয়েই জলের ওপর বাড়ি মারতে লাগলাম। হাত থেকে একমাত্র খাদ্যবস্তু ও ছিনিয়ে নিয়েছে। সমুদ্রে আমার সপ্তম দিনে এখন বিকেল পাঁচটা। এবার দল বেঁধে হাঙররা আসবে। শরীরে একটু বেশি শক্তি লাগছিল, দু'কামড় মাছ খেতে পেয়ে। আর মাছটাকে হারিয়ে যে রাগ জমা হয়েছে, তাই দিয়েই আমি লড়াই চালিয়ে যেতে পারব। আরো দুটো দাঁড় আছে নৌকোতে। ভাঙা দাঁড়টা সরিয়ে আর একটা দাঁড় ধরলাম। দানবগুলোর সঙ্গে যাতে লড়তে পারি। কিন্তু রাগের থেকেও আমার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি অনেক জোরালো। দুটো দাঁড় আমি হাতছাড়া করতে পারি না। জানি না ও দুটো আমার কোন সময় কাজে লাগবে।

অন্যদিনের মতোই রাত নেমে এলো। অন্ধকার রাত। আর ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ সমুদ্র। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে। খাবার জল ধরার আশায় আমি জুতো আর শার্ট খুলে ফেললাম। এই সেই রাত, যাকে সমুদ্র সম্পর্কে আনাড়ীরা বলে এরাত কুকুরের জন্য নয়। সমুদ্রে বলা উচিত এ রাত হাঙরদের জন্য নয়।

নটার পর ঠাণ্ডা হিম হাওয়া বইছে। আমি বাঁচার জন্য বোটের নিচে শুয়ে পড়লাম। কোনো লাভ হলো না। ঠাণ্ডা আমার হাড়ের ভেতর মজ্জায় গিয়ে বিঁধছে। আবার শার্ট আর জুতো পরে নিলাম। বুঝেই নিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি পড়বে আর আমি খাবার জল ধরতে পারবো না। বিরাট বিরাট ঢেউ বইছে। সেই ২৮শে ফেব্রুয়ারির দুর্ঘটনার দিনের থেকেও। বোটটা একটা ডিমের খোলার মতন অশান্ত, ঘোলাটে সমুদ্রে ভাসছে। ঘুমোতে পারলাম না। ঘাড় পর্যন্ত নৌকোর মধ্যে ঢুকে আছি। কারণ হাওয়া জলের থেকেও ঠাণ্ডা কেঁপেই চলেছি। মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা আর সহ্য করতে পারব না। হাত পা নেড়ে ব্যায়াম করে শরীর গরম রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভীষণ দুর্বল। বোটের একদিকে জড়িয়ে ধরেছি যাতে বিরাট ঢেউয়ে সমুদ্রে না পড়ি। দাঁড়ের ওপর মাথাটা রাখলাম, যে দাঁড়টাকে হাঙররা খেয়েছে। আর বোটের নিচে রয়েছে বাকি দুটো দাঁড়।

মাঝরাত্তির নাগাদ ঝড় আরো খারাপ চেহারা নিল। আকাশ ঘন অন্ধকার, ধূসর রঙের। জলভরা হাওয়া কিন্তু এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ল না। যে ঢেউটা ডেস্ট্রয়ারের ডেকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাঝ রাত্রে সেই রকম এক বিশাল ঢেউ আমার

নৌকোটাকে কলার খোসার মতন উঠিয়ে নিল। পরের মুহূর্তে একদম উল্টে গেল।

কি হয়েছে বুঝলাম যখন একেবারে জলে পড়ে গেছি। ওপরে সাঁতরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলাম। দুর্ঘটনার দিন বিকেলের মতন। পাগলের মতন সাঁতরে ওপরে ভেসে উঠে মনে হলো এই ধকলেই মরে যাবো। বোটটা দেখতে পাচ্ছি না। মাথার ওপর শুধু বিরাট কালো কালো ঢেউ। লুই রেনগিফোকে মনে পড়ল। শক্ত চেহারা, ভালো সাঁতারু, ভালো খাইয়ে, তবুও মিটারের কাছাকাছি এসেও বোটে উঠতে পারেনি। আমি এলোমেলো হয়ে গেলাম। ভুল দিকে চললাম। ভুল দিকে তাকিয়ে আছি। আমার পেছনেই এক মিটারের মধ্যে বোটটা দেখতে পেলাম ঢেউয়ে টালমাটাল হচ্ছে। আমি দু'চারবার হাত টেনেই পৌঁছে গেলাম। দু'মুহূর্তেই দু'বার হাত টানা যায়। কিন্তু এই দুই মুহূর্তকেই মনে হতে পারে অনন্তকাল। এতো ভয় পেয়েছিলাম যে এক লাফে বোটে উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে নিচে পড়ে রইলাম। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড দপ্ দপ্ করছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

আমার সৌভাগ্যের তারা

নিজের ভাগ্যের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই। বোটটা যদি সন্ধে পাঁচটায় উল্টোতো, হাঙরগুলো আমাকে টুকরো টুকরো করে ছাড়তো। কিন্তু মাঝ রাত্তিরে ওরা শান্ত, আর বিশেষ করে যখন সমুদ্র ফুঁসছে।

হাঙরে-খাওয়া দাঁড়টাকে ধরেই বোটের ওপরে বসলাম। সব কিছু এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, আমি যা করেছি তার সবটাই মনে হলো নিছক প্রবৃত্তি-তাড়িত। পরে মনে পড়ল জলে যাবার সময় আমার মাথায় একটা দাঁড়ে বাড়ি লাগে। ডুবে যাবার সময় সেটাকেই আমি চেপে ধরেছিলাম। সেটাই এখনো রয়েছে বোটে। অন্যগুলো ভেসে গেছে।

হাঙরে-খাওয়া ছোট দাঁড়টাও যাতে হাতছাড়া না হয় তাই আমি বোটের নিচের দড়ির সঙ্গে ভালো করে সেটাকে বেঁধে রাখলাম। সমুদ্র এখনো গজরাচ্ছে। দেখছি আমার ভাগ্য ভালো। কিন্তু আবার যদি বোটটা ওলটায় হয়েতো আর বোটে উঠতেই পারবো না। এই কথা মনে হওয়াতে বেল্টটা খুলে বোটের দড়ির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেললাম।

ঢেউগুলো পাশে ধাক্কা মারছে। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বোটটা নাচছে। আমি বেল্ট দিয়ে নিজেকে বেঁধে ঠিকই আছি। একটা দাঁড়ও ঠিক আছে। বোটটা আবার না ওলটায় দেখতে দেখতে খেয়াল হলো যে আমি শার্ট আর জুতো প্রায় খুইয়েছিলাম। আমার [illegible] না লাগলে ও দুটো বোটের নিচেই থেকে যেত। দুটো দাঁড়ের সঙ্গে যখন বোটটা উল্টে গিয়েছিল।

এটাই স্বাভাবিক যে শান্ত সমুদ্রে বোট উল্টে যাবে। কারণ এই বোট কাঠের তৈরি, সাদা রঙের ওয়াটার [illegible] কাপড়ে ঢাকা আর নিচটাও শক্ত নয়। কাঠের

নিচে একটা ঝুড়ির মতন ঝোলানো। বোটটা জলে উল্টে গেলে তলাটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। একটাই ভয় বোটটা একেবারেই হাতছাড়া না হয়ে যায়। সেইজন্য নিজেকে যতক্ষণ বেঁধে রেখেছি, ওটা হাজার বার ওলটালেও, হাতছাড়া হবে না।

এটাই বাস্তব। একটা ব্যাপার কিন্তু আমি আগে থেকে বুঝিনি। আগের ঢেউটার পনের মিনিট পর বোটটা দ্বিতীয় বার একটা দুর্ধর্ষ ডিগবাজী খেল। আর আমি ঝড়ের ঝাপটায় ঠাণ্ডা জলভরা হাওয়ার ওপর উড়ে গেলাম। চোখের সামনেই একবারে নরককাণ্ড। বুঝলাম কোনদিকে বোটটা উল্টোবে। ভারসাম্য রাখতে উল্টো দিকে সরে আসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বোটের দড়ির সঙ্গে আমি নিজে বাঁধা মোটা চামড়ার বেল্টে। কি হয়েছে বুঝলাম যখন বোটটা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। আমি একবারে তলায় বোটের দড়ির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। একদম ডুবে যাচ্ছি। হাত দিয়ে পাগলের মতন বেল্টের বাকল্‌স খোলার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ভয় পেয়ে গেছি — কিন্তু ঘাবড়াবো না। কেমন করে বাকলসটা খুলব? বেশি সময় যায়নি। শরীর ভালো থাকলে জলের নিচে আমি আশি সেকেণ্ডও থাকতে পারি। যে মুহূর্তে বোটের নিচে পড়ে গেছি নিঃশ্বাস বন্ধ রেখেছি। পাঁচ সেকেণ্ড চলে গেছে। হাত দিয়ে কোমরের কাছে খুঁজতে খুজতে বেল্টটা পেয়ে গেলাম। পরের মুহূর্তে বাকলেসটাও পেলাম। যেভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধেছি এক হাতে বোটে ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে হলো। কিছু ধরার চেষ্টায়, কিছু সময় গেল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ধাক্কা দিলাম। ডান হাতে বাকল্‌সটা ধরলাম। ঠিক ঠাক বেল্টটাকে তাড়াতাড়ি আলগা করে দিলাম। বাকল্‌স খুলে আমার শরীরটাকে নিচে নিয়ে এলাম। পাশে চলে না গিয়ে দড়ির বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। ফুসফুস দুটো হাঁফাচ্ছে নিঃশ্বাসের জন্য। দু'হাত দিয়ে সমস্ত শক্তি জড়ো করে বোটের পাশটায় চেপে ধরলাম। তখনও নিঃশ্বাস নিইনি। সমস্ত শক্তি দিয়ে বোটটাকে আবার সোজা করলাম। কিন্তু তখনো আমি তলায়।

জল গিলে ফেলছি। আমার তৃষ্ণার্ত গলা জ্বলে উঠছে। কিন্তু ও সবে খেয়াল নেই। জরুরী কাজ হলো বোটটাকে হাত ছাড়া করা যাবে না। জলের ওপর মাথা তুললাম। নিঃশ্বাস নিলাম। ভয়ংকর ক্লান্ত। বোটটার ওপর ওঠার শক্তি নেই। কিছুক্ষণ আগেও হাঙর ভরা এই জলই ছিল আমার কাছে আতঙ্ক। আমি নিশ্চিত এ আমার জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টা। আমার শেষ শক্তি জড়ো করে বোটের ওপর লাফিয়ে উঠলাম, বিধ্বস্ত হয়ে তলায় পড়ে গেলাম।

জানি না কতক্ষণ এইভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম। গলা জ্বলছে। কাটা আঙুলের ডগাগুলো দপ্‌ দপ্‌ করছে।

কিন্তু আমার আসল ভাবনা দুটো। বুকের দাপাদাপি বন্ধ হোক ; আর বোটটা আবার না উল্টে যায়।

www.boiRboi.blogspot.com

সকালের সূর্য

এইভাবেই আমার সমুদ্রের অষ্টম দিনের ভোর হয়ে গেল। সকালেও ঝোড়ো হাওয়া। যদি বৃষ্টি পড়তও, খাবার জন্য একটু জল ধরার শক্তি আমার নেই। বৃষ্টি এলে আমি আবার জেগে উঠব। কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ল না। যদিও জল ভরা বাতাসে আসন্ন বৃষ্টির পূর্বাভাস। সকালেও সমুদ্র উত্তাল। আটটার আগে শান্ত হলো না। তারপর সূর্য উঠল। আকাশ গাঢ় নীল।

প্রায় শেষ হয়ে গেছি। বোটের পাশে শুয়ে কয়েক চুমুক সমুদ্রের জল খেলাম। এখন বুঝেছি এতে শরীরের ক্ষতি করে না। আগে জানতাম না যখন গলার ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছে শুধু তখনই জল খেয়েছি। সাতদিন সমুদ্রে থাকলে জলতেষ্টাই একটা স্বতন্ত্র অনুভূতি হয়ে ওঠে। গলায়, বুকে ব্যথা আর বিশেষ করে কণ্ঠনালীতে দমবন্ধ হয়ে যাবার ভয়। সমুদ্রের জল খানিকটা কষ্ট দূর করল।

ঝড়ের পর সমুদ্র নীল, ছবির মতন। যেমন পাড়ের কাছে ঝড়ে-ভেঙে-পড়া গাছের ডাল, শেকড় শান্তভাবে ভেসে যায়। শঙ্খচিল উড়ে বেড়ায় জলের ওপর সেইদিন সকালে হাওয়া বন্ধ হয়ে যাবার পর জলের ওপরটা ধাতব রঙ হয়ে গেল। বোটটা ভেসে চলল সোজা। উষ্ণ হাওয়ায় আবার শরীর আর মনের শক্তি ফিরে আসছে।

বেশ বড়ো, ধূসর রঙের একটা বুড়ো শঙ্খচিল বোটের ওপরে উড়ছে। কোনো সন্দেহ নেই তাহলে তীরের কাছে এসে গেছি। কয়েকদিন আগে যে শঙ্খচিল ধরেছিলাম সেটা ছিল অল্পবয়সী। ঐ বয়সে ওরা অনেক দূর উড়তে পারে। সমুদ্রের অনেক মাইল ভেতরে। কিন্তু বুড়োটে শঙ্খচিলটা দেখায় বিশাল ভারী, পাড় থেকে একশ মাইল দূরে উড়ে যেতে পারবে না। নতুন করে শক্তি পেলাম। প্রথম দিনগুলোতে যা করতাম আবার সেই দিগন্তে খুঁজতে লাগলাম। দেখছি চারদিক থেকে অনেক শঙ্খচিল উড়ে আসছে।

আমি একটা সঙ্গী পেয়েছি, তাই খুশি। খিদে পাচ্ছে না। বারবার সমুদ্রের জল খাচ্ছি। মাথার ওপর অসংখ্য শঙ্খচিল উড়ছে, ওদের মাঝখানে আমি আর একা নই। মেরী এড্রেস-এর কথা মনে পড়ল। তার এখন কী অবস্থা? ভাবছিলাম আর মনে পড়ছিল ওর গলা, সিনেমায় যখন সংলাপগুলো ও অনুবাদ করে দিত। আসলে ঐ দিনই, একমাত্র একদিনই, কোনো কারণ ছাড়াই, মেরীর কথা মনে পড়ল। আকাশ ভর্তি শঙ্খচিল বলেও নয় — মেরী তখন মবিলের ক্যাথলিক চার্চে আমার আত্মার চিরশান্তির জন্য উপাসনা শুনছে। কারটাগেনায় লেখা চিঠিতে মেরী পরে আমায় জানিয়েছিল, সেই উপাসনাটা হয়েছিল আমার হারিয়ে যাওয়ার অষ্টম দিনে। শুধু আমার আত্মার শান্তির জন্য নয়, মনে হয় আমার শরীরেরও শান্তির জন্য। সেদিন

সকালেই আমি মেরীর কথা ভাবছিলাম। যখন সে উপাসনায়, আর আমি খুশি মনে সমুদ্রে শঙ্খচিল দেখতে দেখতে বুঝতে পারছিলাম তীরের মাটি কাছেই।

সারাদিনই বোটের পাশে বসে দিগন্ত খুঁজে চলেছি। দিনটা ঝকঝকে পরিষ্কার। আমি নিশ্চিত যে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে একবার সত্যিই পাড় দেখতে পেয়েছি। দারুণ জোরে বোট এগোচ্ছে। দুজন লোক মিলে দাঁড় টেনেও এত জোরে এগোতে পারত না। সোজা চলেছে বোটটা, শান্ত নীল জলের ওপর দিয়ে, যেন মোটর লাগানো আছে।

সাতদিন সমুদ্রে থাকলে জলের রঙ একটু বদলালেই ধরা যায়। ৭ই মার্চ বিকেল সাড়ে তিনটের সময় বোটটা যে এলাকায় পৌঁছল সেখানে জলের রঙ আর নীল নেই। ঘন সবুজ। নির্দিষ্ট একটা সীমারেখা। একদিকে সাতদিন ধরে যা দেখছি সেই নীল জল। অন্যদিকে সবুজ জল, বেশি ঘন। আকাশ ভর্তি শঙ্খচিল, খুব নিচু দিয়ে উড়ছে। মাথার ওপর শুনতে পাচ্ছি ওদের ডানা ঝাপটানি। এই লক্ষণগুলো ভুল হবার নয়, সমুদ্রের জলের রঙ বদলে যাওয়া, এই অসংখ্য শঙ্খচিল, বুঝিয়ে দিচ্ছে আমাকে রাত্তিরে সজাগ থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে তীরের প্রথম আলো দেখার জন্য।

www.boiRboi.blogspot.com

১০

আশা ছেড়ে দিয়েছি.....মৃত্যুর অপেক্ষায়

সমুদ্রে অষ্টম রাতে জোর করে ঘুমোতে হলো না। নটার সময় বুড়ো শঙ্খচিলটা বোটের পাশে বসে পড়ল। সারা রাত সেখানেই রইল। আমি বাকি একটা দাঁড়ের ওপরই শুয়ে পড়লাম। শান্ত রাত। বোটটা সোজা এগোচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দিকে। কোথায় চলেছি? নিজেকে জিজ্ঞাসা করছি। সব লক্ষণ দেখে আমি নিশ্চিত সমুদ্রের রঙ, বুড়ো শঙ্খচিল — আমি কালকেই তীরে পৌঁছব। কোনো ধারণাই নেই হাওয়ার টানে বোট কোথায় গিয়ে পৌঁছবে।

আমি অবশ্য নিশ্চিত নই, বোটটা প্রথমে যে পথে চলছিল, সেই পথেই এগিয়েছে কি না। প্লেনগুলো যে পথে উড়ে এসেছিল, সেই পথ ধরলে বোধ হয় কলম্বিয়ায় গিয়ে পৌঁছব। কিন্তু কম্পাস ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। যদি সোজা পথে দক্ষিণে এগিয়ে থাকে নিঃসন্দেহে কলম্বিয়ার ক্যারিবিয়ানের উপকূলে গিয়ে নামব। এও হতে পারে এটা উত্তরে চলে এসেছে। যদি তাই হয়, তাহলে আমি কোথায় আছি কিছুই বুঝছি না।

মাঝ রাত্তিরের একটু আগে যখন ঘুমিয়ে পড়ছি বুড়ো শঙ্খচিলটা কাছে এসে আমার মাথা ঠোকরাতে লাগল। আমার লাগল না। আস্তে করে ঠোকরাচ্ছে, আমার চামড়ায় আঘাত না করে, যেন আদর করছে। মনে পড়ল ডেস্ট্রয়ারের সেই গোলন্দাজ অফিসারের কথা। সে বলেছিল, একজন নাবিকের পক্ষে শঙ্খচিল মারা অমর্যাদাকর। কোনো কারণ ছাড়াই ছোট্ট শঙ্খচিলকে মেরেছি বলে অনুশোচনা হলো।

ভোর পর্যন্ত দিগন্ত খুঁজেই চলেছি। রাত্তিরটা ঠাণ্ডা নয়। কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না তীরের রেখার কোনো চিহ্ন নেই। বোটটা ভেসে চলেছে পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রে। আকাশের তারা ছাড়া আমার চারপাশে আর কোনো আলোর চিহ্ন নেই। আমি নিজে শান্ত হয়ে আছি। শঙ্খচিলটাও মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে। বোটের পাশে মাথা নিচু করে। অনেকক্ষণ ধরে একদম নড়ছে না। কিন্তু আমি নড়লেই সেও নাড়াচাড়া দিয়ে আমার মাথা ঠোকরাচ্ছে।

সকালবেলা আমরা জায়গা পাল্টে নিলাম। শঙ্খচিলটা এখন পায়ের কাছে। এখন আমার জুতো ঠোকরাচ্ছে। বোটের ওপরে নড়াচড়া করছে। আমি চুপ করলে সেও চুপচাপ। মাথা ঠোকরাচ্ছে — কিন্তু নড়ছে না। কিন্তু যেই আমি মাথা নাড়ছি সে চুল ঠোকরাচ্ছে নরম করে। যেন একটা খেলা হচ্ছে। আমি বার বার জায়গা পাল্টাচ্ছি। শঙ্খচিলটাও বার বার আমার মাথার দিকে চলে আসছে। সকাল হয়ে গেল। খুব সহজেই আমি হাত বাড়িয়ে ওর ঘাড়টা ধরে ফেললাম।

মারার কোনো ইচ্ছে ওটাকে আমার নেই। আগের শঙ্খচিলটার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি তা হবে অর্থহীনভাবে বলি দেওয়া। আমি ক্ষুধার্ত, কিন্তু বৃদ্ধ পাখিটাকে দিয়ে ক্ষিধে মেটাব না। ও সারা রাত ধরে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। আমার কোনো ক্ষতি করেনি। যখন ওটাকে ধরলাম ডানা দুটো মেলে দিল। একটু ঝট্‌পট্‌ করল। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। আমি ডানা দুটো মুড়ে ওর ঘাড়ের কাছে চেপে ধরলাম, যাতে নড়তে না পারে। পাখিটা মাথা তুলল। আমি ভোরের প্রথম আলোয় দেখলাম ওর স্বচ্ছ আর ভয়ার্ত চোখ। যদি ওকে মারারও ইচ্ছে থাকত ওর বিস্ফারিত করুণ চোখ দুটো দেখে আমি পারতাম না।

সূর্য উঠল বেশ তাড়াতাড়ি। এত কড়া যে সাতটার মধ্যে হাওয়া গরমে ফুটতে লাগল। আমি তখনো শুয়ে আছি, শঙ্খচিলটাকে চেপে ধরে। আগের দিনের মতনই সমুদ্র গভীর আর সবুজ। কিন্তু কোনোদিকেই তীরের কোনো চিহ্ন নেই। হাওয়া যেন দমবন্ধ করা। আমি বন্দী পাখিটাকে ছেড়ে দিলাম। শঙ্খচিলটা মাথা নাড়িয়ে তীরের বেগে আকাশে ছুটল। দলের সঙ্গে আবার মিশে গেল।

সেদিন সকালের সূর্য আগের যে-কোনো দিনের থেকে বেশি কষ্টকর। নজর রাখছি যাতে আমার ফুসফুস খোলা না থাকে। পিঠ ভর্তি ফোস্কা। যে দাঁড়টার ওপর ঠেস দিয়ে শুয়েছিলাম, সেটাকে সরিয়ে নিতে হলো, কারণ পিঠে কাঠের স্পর্শ সহ্য করতে পারছি না। আমার কাঁধ আর হাত দুটোও জ্বলছে। আঙুল দিয়েও চামড়া স্পর্শ করতে পারছি না। মনে হচ্ছে চামড়া যেন পোড়া কয়লা। চোখও জ্বলছে। কোনো একটা দিকে স্থিরভাবে তাকাতেও পারছি না। কারণ বাতাস ভর্তি অন্ধ করে দেওয়া উজ্জ্বল বলয়। সেইদিন পর্যন্ত আমি বুঝিনি কি দুরবস্থায় আছি। শেষ হয়ে যাচ্ছি, সূর্যের আলোয় আর নুনে ফেটে ফুটে যাচ্ছি। বেশি কষ্ট না করেই হাতের খানিকটা চামড়া তুলে ফেললাম। নিচটা নরম আর লাল। মুহূর্তেই যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল খোলা অংশটা। রোমকূপ দিয়ে ছিটকে রক্ত বেরিয়ে এল।

আমার দাড়ির দিকে নজরই করিনি। এগারো দিন কামাইনি। গলা পর্যন্ত পুরু দাড়ি জমেছে। হাত দিতে পারছি না। কারণ সূর্যের জ্বালায় চামড়ার ভয়ংকর ব্যথা। আমার বিকট মুখ আর আহত শরীর মনে করিয়ে দিচ্ছে এই একাকীত্ব আর বিপন্ন দিনগুলোয় আমি কি কষ্ট পাচ্ছি। আবার হতোদ্যম হয়ে পড়লুম। পাড়ের কোনো চিহ্ন নেই। এখন ভরা দুপুর। মাটিতে পৌঁছনোর সব আশা ছেড়ে দিয়েছি। এখনো যখন তীরের রেখা দেখা যাচ্ছে না, বোট অনেক দূর এগোলেও সন্ধের মধ্যে পাড়ে গিয়ে পৌঁছতে পারব না।

আমি মরতে চাই

বারো ঘন্টা ধরে যে সুখী ভাবটা ক্রমশ জেগেছিল, এক মিনিটে তার চিহ্নও রইল না। আমার শক্তি ফুরিয়ে গেছে, আর কোনো চেষ্টাও করছি না। ন'দিনের মধ্যে এই প্রথম আমি মুখ নিচু করে ঘুমোতে লাগলাম। পিঠ পুড়ে যাচ্ছে সূর্যের তাপে।

শরীরের ওপর আর কোনো মায়া নেই। এই ভাবেই রাত্তির পর্যন্ত থাকলে, আমি মারা যাবো।

একটা সময় আগে যখন কোনো যন্ত্রণাও আর বোঝা যায় না। অনুভূতি চলে যায়। বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। স্থানে ও সময়ের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। বোটের মধ্যে মুখ নিচু করে, হাত দুটো পাশে ঝুলিয়ে, তার ওপর দাড়ি ভর্তি মুখ রেখে, আমি সূর্যের নির্দয় কামড় খেতে লাগলাম। ঘন্টার পর ঘন্টা। বাতাস ভরে গেল বিচিত্র সব দাগে। আমি বিধ্বস্ত হয়ে চোখ বুজে ফেললাম। সূর্যের আলোয় শরীরও আর জ্বলছে না। ক্ষিধে নেই, তেষ্টাও নেই। কিছুই অনুভব করছি না, জীবন বা মৃত্যু থেকে নিরাসক্ত। মনে হলো আমি মারা যাচ্ছি। সেই চিন্তাই আবার একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে এল।

যখন চোখ খুললাম, আমি মবিলে চলে গেছি। দমবন্ধ করা গরমের মধ্যে একটা পার্টিতে গেছি। আমার জাহাজের সঙ্গীদের নিয়ে, রাস্তার ওপর খোলামেলা একটা কাফেতে। সঙ্গে রয়েছে মার্সে নার্সের মবিলের একটা দোকানের ইহুদী কেরানি। আমরা নাবিকরা সেখানে কাপড় জামা কিনতাম। সেই-ই আমাদের ব্যবসায়িক কার্ডগুলো দিয়েছিল। আট মাস ধরে যখন জাহাজ সারাই হচ্ছিল, মার্সে নার্সের আমাদের কলম্বিয়ার নাবিকদের বিশেষ যত্ন নিত। কৃতজ্ঞতাবশত ওর কাছ থেকেই আমরা কেনাকাটা করতাম। সে ঠিকমত স্পেনীয় ভাষা বলত। যদিও সে আমাদের বলেছিল স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে এমন কোনো দেশেই সে কোনোদিন থাকেনি।

এই কাফেতে আমরা যেতাম প্রতি শনিবার। শুধু ইহুদীরা আর কলম্বিয়ার নাবিকেরা থাকত। প্রতি শনিবার একই মহিলা মঞ্চে নাচত। তার পেট দেখা যেতো আর মুখে ঢাকা থাকত একটা ওড়না। আরবী ফিল্মের নর্তকীদের মতো। আমরা বাহবা দিতাম, আর পাত্র থেকে বিয়ার খেতাম। আমাদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল ছিল মার্সে নার্সের। ইহুদী, দোকানের কেরানি, সস্তা আর সুন্দর কাপড় বিক্রি করত কলম্বিয়ার নাবিকদের।

কতক্ষণ জানি না আমি এই ঘোরের মধ্যে ছিলাম। মবিলের পার্টি নিয়ে অলীক দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলাম যেন দেরি হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখলাম বোট থেকে পাঁচ মিটার দুরত্বে এক বিশাল হলুদ কাছিম। দাগ কাটা মাথা ভাবলেশহীন অনড় দুটো চোখ, যেন দুটো বিশাল স্ফটিকের বল। আমার দিকে ভূতের মতন তাকিয়ে আছে। মনে হলো আবার দুঃস্বপ্ন দেখছি, উঠে বসলাম। দারুণ ভয় পেয়ে গেছি। চারমিটার লম্বা মাথা থেকে গা পর্যন্ত দানবের মতো জন্তুটা আমাকে দেখে জলের নিচে চলে গেল। একদলা ফেনা পড়ে রইল। বাস্তব না অসাড় কল্পনা বুঝতে পারলাম না। এখনোও আমি জানি না এটা বাস্তব ছিল কিনা। কয়েক মিনিট ধরে আমি সেই বিশাল হলুদ কাছিমটাকে দেখতে লাগলাম। বোটের আগে আগে সাঁতার কেটে চলেছে। বিকট দাগ কাটা মাথা জলের ওপরে তুলে। ওটা বাস্তব

কি অসাড় কল্পনা যাই হোক — শুধু এটা জানি যে কাছিমটা একবার আঁচড় দিলেই বোটটা একবারে উল্টে বেশ কয়েকবার ঘুরপাক খাইয়ে ছাড়বে।

এই ভয়ংকর দৃশ্যটা কল্পনা করে আমার ভয় জেগে উঠল। আর ভয় আমাকেও জাগিয়ে তুলত। ভাঙা দাঁড়টাকে চেপে ধরলাম। উঠে বসলাম, তৈরি হলাম লড়াইয়ের জন্য। ঐ জন্তুটার সঙ্গে, অথবা যেই-ই আসবে বোটটাকে ওলটাতে, তার সঙ্গেই। প্রায় পাঁচটা বাজে। সব সময়, যে রকম সময় মেনে চলে, হাঙরেরা ঠিক জলের ওপর চলে এসেছে।

বোটের পাশের দিকটা দেখলাম। যেখানে আমি প্রতিদিনের চিহ্ন কেটে রেখেছি। গুনে দেখলাম আটটা দাগ। ভুলে গেছি আজকের দিনটা লিখতে। চাবি দিয়ে আর একটা দাগ দিলাম, ওটাই বোধ হয় শেষ দাগ। অধৈর্য আর রাগে বুঝছি, বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক কষ্ট। সকাল থেকেই আমি মৃত্যুই বেছে নিয়েছিলাম। তবুও বেঁচে আছি হাতে একখণ্ড দাঁড় নিয়ে। জীবনের জন্য লড়তে প্রস্তুত। শুধু যার জন্যে লড়াই আমার কাছে এখন আর তার কোনো মানেই নেই।

রহস্যময় শেকড়

ধাতুর মতন গরম সূর্য, হতাশা, তৃষ্ণা এই প্রথম অসহ্য হয়ে উঠেছে। ঠিক তার মধ্যে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। বোটের মাঝখানে দড়ির জালের মধ্যে লাল রঙের শেকড় দেখতে পেলাম। বয়াকাতে এই রকমেরই শেকড় থেতলে রঙ করার কাজ হয়। ঠিক নামটা মনে নেই। ওটা কতক্ষণ ধরে ওখানে আছে, তাও জানি না। ন'দিন ধরে সমুদ্রে এক গাছা ঘাসও দেখিনি। কি করে এল জানি না, শেকড়টা মেঝের দড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তীরের অভ্রান্ত আরেকটি নিশানা। তীর যদিও কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

শেকড়টা তিরিশ সেন্টিমিটার লম্বা। আমি ক্ষুধার্ত, কিন্তু খাওয়ার চিন্তা করারও শক্তি নেই। অলসভাবে ওটাকে কামড়াতে লাগলাম। রক্তের মতন আস্বাদ। ভারী মিষ্টি তেলের মতন কি একটা বেরিয়ে আসছে। আমার গলায় আরাম লাগছে। মনে হলো বিষের স্বাদ, তবুও খেতে লাগলাম। পুরো গাঁটিটাই গিলে ফেললাম। একটুকরোও পড়ে রইল না।

খাওয়ার পর তেমন কিছু ভালো বোধ করলাম না। মাথায় এল ঐ শেকড়টা বোধ হয় অলিভ গাছের ডাল। বাইবেলের গল্প মনে পড়ল। নোয়া যখন ডাহুকটাকে মুক্তি দিয়েছিল, সেটা নৌকোয় ফিরে এসেছিল, একটা অলিভের ডাল নিয়ে। এটাই নিশানা যে সমুদ্র পাড় থেকে সরে এসেছে। আমি বিশ্বাস করে নিলাম বাইবেলের সেই অলিভ ডালের কাহিনী, যেটা দিয়ে আমার ন'দিনের ক্ষিধে মিটিয়েছি।

সমুদ্রে এক বছরও অপেক্ষা করা যায়। কিন্তু একটা দিন আগে, যখন এক ঘন্টাও আর সহ্য করা যায় না। আগের দিন ভেবেছি আমার ঘুম ভাঙবে সমুদ্রের পাড়ে।

কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা কেটে গেছে। তাকিয়ে আছি শুধু সমুদ্র আর আকাশের দিকে ন'দিন। আজ ন'দিন। এখন এই অপেক্ষা করাও অর্থহীন। সমুদ্রে আমি আতংকিত হয়ে ভাবছিলাম, মারা যাবার ন'দিন পরে বোগোতার ওলেয়াতে। আমার বাড়ি এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আমার পরিবারের আত্মীয় বন্ধুতে ভর্তি হয়ে গেছে। অপেক্ষার এইটাই শেষ রাত। আগামীকাল তারা বেদীটা ভেঙে ফেলবে, আস্তে আস্তে মেনেও নেবে আমি মারা গেছি।

সে রাত্তিরেও আমি ক্ষীণ আশা ছাড়িনি। কেউ না কেউ আমাকে মনে করবে। আমাকে উদ্ধার করারও চেষ্টা করবে। কিন্তু যখন ভাবছি আমার পরিবারের কাছে এটা আমার মৃত্যুর ন'দিন আর আমার জেগে থাকার শেষ দিন, আমি সমুদ্রের মধ্যে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। সবচেয়ে ভালো হতো মরেই গেলে। বোটের নিচে শুয়ে পড়লাম। চিৎকার করতে ইচ্ছে করল — "আমি আর কখনো উঠবো না।" শব্দগুলো গলায় আটকে গেল। স্কুলের কথা মনে পড়ল। আমি 'ভারজিন অব কারমেন'-এর মেডেলটা ঠোঁটে ছোঁয়ালাম। প্রার্থনা করতে লাগলাম। আমার পরিবারের লোকেরাও এখন তাই করছে। তারপর মনে হলো সবই তো ঠিক আছে। কারণ বুঝতে পারছি, আমি মারা যাচ্ছি।

www.boiRboi.blogspot.com

১১

দশম দিন আরেকটা অলীক দুঃস্বপ্ন ঃ জমি

ন'দিনের রাতটা দীর্ঘতম। বোটের নিচে শুয়ে আছি, ঢেউগুলো পাশে মৃদু ধাক্কা দিচ্ছে। আমার অনুভূতিগুলো আর নিয়ন্ত্রণে নেই। প্রতিটি ঢেউ এর ধাক্কায় সেই বিপর্যয়কর ঘটনাটা ফিরে ফিরে মনে আসছে। লোকে বলে যে, মৃত্যুর আগে মানুষ পেছনের দিকে চলে। রাতে সেই রকমই একটা ব্যাপার হলো। জ্বরের ঘোরে সেই সর্বনাশা রাতের ঘটনাটা আবার ফিরে এল। আমি আবার ডেস্ট্রয়ারে রেমন হেরেরার সঙ্গে ডেকে শুয়ে আছি রেফ্রিজারেটর আর স্টোভের মধ্যে। লুই রেনগিফোকে নজরদারী করছে। যতবার ঢেউয়ের ধাক্কা লাগছে, মনে হচ্ছে সব মালপত্র গড়িয়ে পড়ছে। আমি সমুদ্রের তলায় নেমে যাচ্ছি, আবার ওপরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছি।

তারপর মিনিট ধরে ধরে আমার ন'দিনের নির্বাসন, উদ্বেগ, খিদে, তেষ্টা স্পষ্ট আর পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। যেমন সিনেমায় হয়। প্রথমে পড়ে যাওয়া, তারপর বোটের চারপাশে সহকর্মীদের আর্তনাদ, খিদে, তেষ্টা, হাঙর, মবিলের স্মৃতি পরপর ভেসে চলেছে। রূপকল্পের মতো। বোট থেকে যেন পড়ে না যাই সেজন্যও সতর্ক। আবার মনে হলো, ডেস্ট্রয়ারের ডেকে দড়ি দিয়ে নিজেকে বাঁধছি ঢেউ যাতে আমায় ভাসিয়ে না নেয়। এত জোরে বেঁধেছি যে আমার কব্জি, গোড়ালি আর বেশি করে হাটুতে ব্যথা করছে। ভালো করে বাঁধা সত্ত্বেও ঢেউ এসে আমাকে তলিয়ে নিয়ে গেছে। আমি ছাড়িয়ে নিয়ে সাঁতার কেটে ওপরে উঠছি, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

কয়েকদিন আগেও আমি বোটের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখার কথাই ভেবেছি। সেই রাতেও তাই করতাম। কিন্তু নিচ থেকে দড়ি খুঁজে বার করার ক্ষমতাও নেই শরীরে। আমি চিন্তাও করতে পারছি না। ন'দিনের মধ্যে এই প্রথম বুঝতেও পারছি না, আমি কোথায় আছি। সেই রাতে যে অবস্থায় ছিলাম তাতে সত্যিই বিস্ময়কর যে ঢেউগুলো আমায় তলায় ফেলে দেয়নি। আমি বুঝতেও পারতাম না কি হচ্ছে। অলীক দুঃস্বপ্ন আর বাস্তবতার ফারাক বুঝতে পারছি না। যদি একটা ঢেউ এসে বোটটাকে উলটিয়েও দিত, আমি ভাবতাম বোধ হয় আরেকটা অলীক দুঃস্বপ্ন। আমি বোধ হয় ডেস্ট্রয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছি। সেই রাতে বারবার সেইরকমই মনে হচ্ছিল। আর তার ফলে সোজা সমুদ্রে গিয়ে পড়তাম। যারা ন'দিন ধরে ধৈর্য নিয়ে বোটের পাশে অপেক্ষা করছে সেই হাঙরদের খাবার হয়ে যেতাম।

কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো, সেই রাতেও আবার রক্ষা পেয়ে গেলাম। আমার সব অনুভূতি শেষ হয়ে গেছে। ন'দিনের একাকীত্ব মিনিটের পর মিনিট ধরে ফিরে ফিরে আসছে। কিন্তু আমি দড়ি দিয়ে বোটে নিজেকে বেঁধে রাখার মতই নিরাপদ।

www.boiRboi.blogspot.com

ভোরবেলা আবার ঠাণ্ডা হাওয়া। জ্বর হয়েছে। আমি কাঁপছি। হাড় পর্যন্ত কাঁপুনি। ডান হাঁটুতে ব্যথা। সমুদ্রের নুন ঘা-টাকে শুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখনো কাঁচা ঘা, প্রথমদিনের মতই। চেষ্টা করেছি যাতে ওখানটায় আর আঘাত না লাগে। মুখ নিচু করে, হাঁটুটা বোটের নিচে রাখতে ঘা-টা দারুণ যন্ত্রণা দিয়ে উঠল। এখন বিশ্বাস করি এই ঘা-টা আমার জীবন বাঁচিয়েছে, এই দুর্যোগের মধ্যেও আমি ব্যথা অনুভব করছি। আমাকে বাধ্য করছে শরীরের ওপর নজর রাখতে। জ্বালাধরা মুখে ঠাণ্ডা লাগছে। বেশ কয়েক ঘন্টা আমি আবোল তাবোল কথা বলে চলেছি জাহাজের সহকর্মীদের সঙ্গে। মেরী এড্রেসের সঙ্গে আইসক্রীম খাচ্ছি, সেখানে একটা বেসুরো বাজনা বাজছে।

অফুরন্ত সময় কেটে গেছে। মনে হলো আমার মাথাটা চৌচির হয়ে যাবে। আমার কপালের কাছটা কাঁপছে, আর হাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা। হাঁটুতে কাঁচা ঘা-টা মালুম দিচ্ছে। ফুলে অসাড় হয়ে গেছে। হাঁটুটা যেন বিশাল, আমার শরীরের থেকেও বড়ো হয়ে গেছে।

বুঝতে পারছি ভোর হয়েছে, আমি বোটেই আছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না কতক্ষণ এখানে আছি। অনেক চেষ্টা করে মনে পড়ল বোটের গায়ে আমি ন'টা আঁচড় কেটেছি। কিন্তু শেষ দাগটা কখন দিয়েছি মনে নেই। মনে হচ্ছে অনেক সময় চলে গেছে, যে বিকেলে আমি বোটের নিচে দড়িতে আটকে থাকা শেকড়টা খেয়েছিলাম। সেটা কী স্বপ্ন? মুখে কড়া একটা মিষ্টি স্বাদ লেগে আছে। কিন্তু কি খেয়েছিলাম তাও মনে করতে পারছি না। সেটা আমাকে কোনো শক্তি জোগায়নি। সবটাই খেয়েছিলাম, পেট তবু ফাঁকা। আমি একেবারে শেষ হয়ে গেছি।

তারপর থেকে আর কতদিন কেটেছে? শুধু বুঝতে পারছি আর একটা ভোর আসছে। কত রাত আমার চলে গেছে জানি না, বোটের তলায় বিপর্যস্ত হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছি মৃত্যুর। পাড়ের জমির থেকেও সে আরও দূরে। আকাশ গত রাতের মতন লাল। আমার বিভ্রান্তিই বাড়িয়ে দিল — এখন ভোর না গোধুলি?

তীরের মাটি

আহত হাঁটুর ব্যথায় জায়গা বদল করছি। একদম ঘুরে বসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। ক্লান্তিতে মনে হচ্ছে দাঁড়াতে পারব না। বোটের পাশে হাত দিয়ে, শরীরটাকে তুলে, আহত পাটা সরালাম। চিৎ হয়ে বোটের পাশে মাথা দিয়ে শুয়ে রইলাম। ভোর হয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে দেখলাম। চারটে বাজে। প্রতিদিন এই সময়ই আমি দিগন্ত খুঁজতে থাকি। কিন্তু জমি দেখতে পাওয়ার সব আশা চলে গেছে। আমি আকাশ দেখতে লাগলাম। ঘন লাল রঙ কি ভাবে হালকা নীল হয়ে যাচ্ছে। হাওয়া এখনো ঠাণ্ডা। জ্বর জ্বর লাগছে। অসহ্য যন্ত্রণায় হাঁটু কাঁপছে। অনুশোচনা হচ্ছে কেন এখনো মরিনি। কোনো শক্তি নেই শরীরে, তবু জ্যান্ত আছি।

হতাশ লাগছে। মনে হয়েছিল গতকালের রাতটাও আমি বাঁচব না। তবু আমি আছি। আগে যেমন ছিলাম তেমনই, বোটের মধ্যে যন্ত্রণায় ভুগছি। শুরু করছি একটা নতুন দিন। আবার আর একটা দিন। অসহ্য সূর্য মাথার ওপর। পাঁচটা থেকে বোটের চারপাশে একদল হাঙর।

www.boiRboi.blogspot.com

আকাশ নীল হয়ে গেলে আমি দিগন্তের দিকে তাকালাম। জল শান্ত, সবদিকেই সবুজ। বোটের সামনে ভোরের আলো-আঁধারিতে দেখলাম, উজ্জ্বল আকাশের নিচে, সারি সারি নারকেল গাছের লম্বা বিশাল ছায়া।

আমি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। আগের দিন ছিলাম মবিলের একটা পার্টিতে, তারপর দেখেছিলাম একটা বিশাল হলুদ কাছিম, রাত্তিরবেলা ছিলাম বোগোটায়, আমার বাড়িতে লা সালে দে ভিল্লা ভিসেন সিও এ্যাকাডেমিতে। ডেস্ট্রয়ারে আমার জাহাজের সহকর্মীদের নিয়ে। এখন আমি পাড় দেখতে পাচ্ছি। যদি এইরকম অলীক দুঃস্বপ্ন চার-পাঁচদিন আগে দেখতাম, আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যেতাম। বোটটাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি পাড়ে গিয়ে উঠতাম।

আমি এখন প্রস্তুত সমস্ত অলীক দুঃস্বপ্নের জন্য। নারকোল গাছগুলো এত স্পষ্ট যে বাস্তব মনে হচ্ছে না। তারা কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে নেই। কোনো সময় মনে হচ্ছে একেবারে বোটের পাশে, আবার কখনো মনে হচ্ছে তিন চার কিলোমিটার দূরে। কোনো আনন্দই হচ্ছে না। আর এর জন্যেই মরে যেতে ইচ্ছে করছে। নাহলে এই দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতেই পাগল হয়ে যাব। আবার আকাশের দিকে চাইলাম। অনেক ওপরে মেঘমুক্ত গভীর নীল আকাশ।

পৌনে পাঁচটায় দিগন্তে সূর্য উঠল। আগের রাত্তির ছিল আমার কাছে ভয়ংকর কিন্তু এখন নতুন দিনের সূর্যকে মনে হচ্ছে শত্রু। এক দানবের মতো অবাধ্য শত্রু। আমার শরীরের চামড়া ছিঁড়ে ফেলছে, আমাকে ক্ষিধে তেষ্টায় পাগল করে দিচ্ছে। সূর্যকে অভিশাপ দিলাম, দিনটাকে অভিশাপ দিলাম। ভাগ্যকে অভিশাপ দিলাম। কেন ন'দিন ভাসতে ভাসতে বেঁচে আছি। না খেয়ে মরিনি কেন। হাঙরের পেটেই বা যাইনি কেন।

চরম দূরবস্থায় বোটের নিচে ভাঙা দাঁড়টা খুঁজতে লাগলাম। ওর ওপরেই শুয়ে পড়ব। আমি কখনো শক্ত বালিশে ঘুমোতে পারতাম না। আর এখন উন্মত্তের মতন হাঙরে খাওয়া এক খণ্ড কাঠই খুঁজছি।

দাঁড়টা বোটের দড়ির সঙ্গে এখনো বাঁধা। এটাকে তুলে আস্তে আস্তে আমার ব্যথা ধরা পিঠের নিচে দিয়ে, বোটের পাশে মাথাটা রাখলাম। আর তখনই স্পষ্ট দেখতে পেলাম উদীয়মান লাল সূর্যকে পেছনে রেখে, টানা সবুজ তীরের রেখা।

প্রায় পাঁচটা বাজে। স্ফটিক-স্বচ্ছ সকাল। কোনো সন্দেহ নেই পাড়ের জমি বাস্তব। জমি দেখতে পেয়ে আগের দিনগুলোর সমস্ত ব্যর্থ আনন্দ, প্লেন, জাহাজের আলো, শঙ্খচিল, সমুদ্রের রঙ বদলালো, আবার জীবন্ত হয়ে উঠল।

জমি দেখতে পেয়ে নিজেকে এত শক্ত লাগছে যে সেই মুহূর্তে যদি ডেস্ট্রয়ারে

সকালের জল খাবারে আমি দুটো ভাজা ডিম, মাংস, কফি, পাঁউরুটি খেতাম তাহলেও তা লাগত না। আমি লাফিয়ে উঠলাম। পরিষ্কার দেখলাম তীরের ছায়া আর নারকোল গাছের সারি। কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না। আমার ডানদিকে, দশ কিলোমিটার দূরে ছোট ছোট পাথরের খাঁড়ির ওপর দেখছি সূর্যের প্রথম আলোক ধাতব ঝলকানি। আনন্দে পাগল হয়ে আমি ভাঙা দাঁড়টা ধরে সোজা তীরের দিকে বাইতে লাগলাম।

মনে হচ্ছে বোট থেকে তীর দু'কিলোমিটারের মতো। আমার হাত দুটো ক্ষতবিক্ষত। শক্তি কম, পিঠেও ব্যথা। কিন্তু আমি ন'দিন ধরে হাল ছাড়িনি, এই দশ দিন সবে শুরু হচ্ছে, এখন হাল ছেড়ে দেবো? যখন সামনে দেখতে পাচ্ছি জমি? আমি ঘামতে লাগলাম। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া আমার ঘাম শুকিয়ে দিল, হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডা, আমি দাঁড় বেয়েই চলেছি।

কিন্তু কোথায় তীর?

এত বড় বোটের জন্য এই দাঁড় কোনো কাজে আসে না। এটা শুধু একটা লাঠি। জল কত গভীর তাও মাপা যায় না এতে। প্রথম কয়েক মিনিট আবেগ তাড়িত অবিশ্বাস্য শক্তি নিয়ে একটু এগোলাম। তারপর হাঁফিয়ে গেলাম। দাঁড়টা একটু তুলে, উজ্জ্বল সবুজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম তীরের সমান্তরাল একটা স্রোত বয়ে চলেছে, আর সেটাই বোটটাকে নিয়ে যাচ্ছে খাঁড়ির দিকে।

অন্য দাঁড়গুলো হারানোর জন্য ভীষণ অনুতপ্ত লাগছে। যদি একটাও আস্ত দাঁড় থাকত, হাঙরে টুকরো করা এটার মতন নয়, তা হলে আমি এই স্রোতটাকে সুযোগ নিতে পারতাম। আমার ধৈর্য ধরা প্রয়োজন, যতক্ষণ না বোটটা খাঁড়িতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। সকালের প্রথম সূর্যের আলোয় খাঁড়িগুলো জ্বল জ্বল করছে যেন ছোট সূঁচের পাহাড়। জমিতে পা দেওয়ার জন্য আমি এতই উন্মুখ, আর ওখানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা এখনো এত দূরে যে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। পরে জেনেছিলাম ঐ খাঁড়িগুলো পুনটা কারিবানার ঢাকা পড়া জলভূমি। স্রোত যদি আমাকে সেদিকে নিয়ে যেত আমি পাথরে ধাক্কা খেতাম।

আমি হিসাব করতে লাগলাম শরীরে কত শক্তি এখনো বাকি আছে। পাড়ে পৌঁছতে দু'কিলোমিটার সাঁতার কাটতে হবে। সাধারণভাবে দু'কিলোমিটার সাঁতরাতে আমার এক ঘন্টারও কম লাগে। এক টুকরো মাছ আর শেকড় ছাড়া এই দশ দিন ধরে না খেয়ে, সারা শরীরে ফোস্কা আর আহত হাঁটু নিয়ে, কতক্ষণ সাঁতার কাটতে পারব, জানি না। হাঙরের কথা মনে করারও সময় নেই। দাঁড়টা ফেলে দিলাম। চোখ বন্ধ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ঠাণ্ডা জলে পড়ে বেশ ভালো লাগল। কিন্তু অন্যদিকে খারাপ হলো যে তীরটা আর দেখতে পাচ্ছি না। জলে নেমে বুঝলাম আমি দুটো ভুল করেছি। জামাটা

খুলিনি, আর জুতোটা ভালো করে বাঁধিনি। সাঁতার কাটার আগে এ দুটো করা দরকার। আমি ভেসে থাকার চেষ্টা করলাম। শার্টটা খুলে শক্ত করে কোমরে বাঁধলাম। জুতোর দড়ি শক্ত করলাম। তারপর সাঁতরাতে শুরু করলাম। প্রথমে বেপরোয়াভাবে তারপর আস্তে আস্তে। মনে রেখে যে প্রতিটি হাতের টানে আমার শক্তিক্ষয় হচ্ছে, আর এখনো আমি তীর দেখতে পাইনি।

পাঁচ-মিটার এগোনোর পর ভার্জিন অব কারমেনের মেডেল দেওয়া চেনটা বুঝলাম খুলে এসেছে। একটু থামলাম। ওটাকে ধরে ফেললাম, ধরতে গিয়ে অশান্ত সবুজ জলে কিছুটা ডুবে গেলাম। পকেটে ঢোকানোর সময় নেই, দু'দাঁতের ফাঁকে চেনটা কামড়ে ধরে সাঁতরে চললাম।

বুঝতে পারছি শক্তি কমে আসছে, এখনো পাড়ের জমি দেখতে পাচ্ছি না। আবার এক আতঙ্ক এও হতে পারে, বা নিশ্চিত, এই তীরও আর একটা অলীক দুঃস্বপ্ন। ঠাণ্ডা জলে বেশ ভালো লাগছে, সমস্ত মানসিক প্রবৃত্তিগুলি ফিরে এসেছে। আমি উত্তেজনায় সাঁতরে চলেছি এক কাল্পনিক তীরের দিকে। অনেক দূর এগিয়ে গেছি, ফিরে গিয়ে বোটটাকে খোঁজা অসম্ভব।

www.boiRboi.blogspot.com

১২
আজব দেশে নতুন জীবন

পনেরো মিনিট ধরে ভয়ঙ্কর জোরে সাঁতার কাটার পর আমি আবার জমি দেখতে পেলাম। এখনো এক কিলোমিটার দূরে। এখন কোনো সন্দেহ নেই নিছক ভৌতিক ব্যাপার নয়, — এটা বাস্তব। নারকোল গাছগুলোর মাথায় সূর্য সোনা ঝরাচ্ছে। পাড়ে কোনো আলো জ্বলছে না। সমুদ্র থেকে কোনো শহর, এমন কি কোনো বাড়িও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওটা নিশ্চয়ই তীরের জমি।

কুড়ি মিনিট পর আমি বিধ্বস্ত। কিন্তু আমি স্থির নিশ্চিত, আমি পারবোই। বিশ্রামের জোরে সাঁতার কাটছি, আবেগ যেন আমার নিয়ন্ত্রণকে শিথিল না করে দেয়। আমার জীবনটা অর্ধেক কেটেছে জেলে। কিন্তু ৯ই মার্চের এই সকালের আগে ভালো সাঁতারু হবার গুরুত্ব আমি বুঝিনি, তারিফও করিনি। আমার শক্তি ক্ষয় হয়েই চলেছে, কিন্তু পাড়ের দিকে সাঁতরে চলেছি। যত কাছে যাচ্ছি তত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নারকোল গাছগুলো।

সূর্য উঠে গেল। মনে হলো আমি বোধ হয় এখন মাটি স্পর্শ করতে পারব। চেষ্টা করলাম, কিন্তু এখনো বেশ গভীর। মনে হচ্ছে আমি কোনো সমুদ্রের বেলাভূমিতে পৌঁছচ্ছি না। পাড়ের কাছেও জল বেশ গভীর। আমাকে সাঁতরেই যেতে হচ্ছে। ঠিক কতক্ষণ সাঁতরেছি জানি না। পাড়ের কাছাকাছি আসতে মাথার ওপর গরম সূর্য। কিন্তু কয়েক মিনিটের ঠাণ্ডা জলে ভয় পেয়েছিলাম পেশীতে খিঁচ ধরতে পারে। কিন্তু শরীর বেশ তাড়াতাড়ি তাজা হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে জল এখন কম ঠাণ্ডা। আমি অবসাদগ্রস্ত। যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি। কিন্তু ক্ষিধে আর তেষ্টাকে ছাড়িয়ে, মনের জোর আর বিশ্বাসে সাঁতরে চলেছি।

এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নরম সূর্যের আলোয় ঘন গাছ-গাছালি। দ্বিতীয়বার মাটি স্পর্শ করার চেষ্টা করলাম। ঠিক পায়ের নিচেই মাটি। সমুদ্রে দশদিন ভাসতে ভাসতে মাটির এই স্পর্শ পাওয়া — এক নিদারুণ অনুভূতি।

হঠাৎ বুঝলাম আমার চরম দুর্দশা এখনো বাকি। আমি একদম শক্তিহীন। দাঁড়াতে পারছি না। জলের নিচের চোরা স্রোত, আমাকে টেনে আবার জলে ফেলে দিচ্ছে, পাড় থেকে দূরে। আমার দাঁতের ফাঁকে **ভার্জিন অব্ কারমেনের** মেডেল। আমার ভিজে জামা কাপড় আর রবারের সোল লাগানো জুতো ভয়ঙ্কর ভারী। কিন্তু এই অসম্ভব কঠিন পরিস্থিতিতেও আমি অবিচল। যে কোনো মুহূর্তে কারো দেখা পাব।

জামা প্যান্ট না খুলেই আমি চোরা স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম। তার জন্য এগোতে অসুবিধা হচ্ছে। মনে হচ্ছে ক্লান্তিতে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি।

আমার কোমরের একটু ওপর পর্যন্ত জল। আপ্রাণ চেষ্টা করে একটু সামনে এগোলাম, যেখানে উরু পর্যন্ত জল। এবার হামাগুড়ি দেব। হাত আর হাঁটু দিয়ে বালি আঁকড়ে আঁকড়ে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। হচ্ছে না, ঢেউ আমাকে আবার ফেলে দিচ্ছে। বালির ছোট ছোট দানা আমার হাঁটুর ঘা ঘস্‌টে দিচ্ছে। বুঝতে পারছি রক্ত বেরোচ্ছে, কিন্তু কোনো ব্যথা নেই। আঙুলের মাথাগুলো ছাল উঠে গেছে। নখের পেছনে মাংসের মধ্যে বালি আঁকড়ে আমি গুড়ি মেরে এগোচ্ছি। আর একটা আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল। মনে হলো মাটি আর সোনালী নারকোল গাছগুলো আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। পৃথিবী আমায় গিলে ফেলছে।

সম্ভবত ভয়ঙ্কর ধকলের ফলেই এই বিভ্রান্তি। আমি চোরাবালির খপ্পরে পড়তে পারি — এই ধারণা আমাকে প্রচণ্ড শক্তি জোগালো। এই জোর আসে সন্ত্রাস থেকে। আমার চামড়া-ওঠা আঙুলগুলোর ওপর কোনো দয়া মায়া না করেই দারুণ যন্ত্রণা নিয়েই চোরা স্রোতের বিরুদ্ধে এগোতে লাগলাম। দশ মিনিট বাদেই দশ দিনের তৃষ্ণা আর অভুক্ত-থাকার যন্ত্রণা আমার শরীরের ওপর তাদের পাওনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি উষ্ণ, শক্ত পাড়ের জমির ওপর পড়ে গেলাম। কোনো চিন্তা না করে, কাউকে ধন্যবাদ না জানিয়ে, উল্লসিত না হয়ে, ইচ্ছা শক্তির জোরে আর অদম্য জীবন তৃষ্ণায় আমি এই একখণ্ড নিঃস্তব্ধ অচেনা তীর খুঁজে পেয়েছি।

মানুষের পায়ের ছাপ

পাড়ে এসে প্রথমেই মন টেনে নেয় নিঃস্তব্ধতা। কিছু বোঝার আগেই গভীর নিঃস্তব্ধতা ঘিরে ফেলে। একটু পরে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ঢেউ-এর দূরে, করুণভাবে পাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় নারকোল গাছগুলোর মর্মরধ্বনি বুঝিয়ে দিচ্ছে আমি পাড়ে এসে পৌঁছেছি। আমি নিজেকে বাঁচাতে পেরেছি। যদিও জানি না পৃথিবীর কোথায় আছি আমি।

একটু সামলে নিয়ে শুয়ে শুয়েই আমার চারপাশটা দেখলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন রুক্ষ। আমি মানুষের অস্তিত্বের একটু চিহ্ন দেখলেও সেটা আমার কাছে দৈব রহস্য দেখার গুরুত্ব পাবে। দারুণ খুশি মনে আমি গরম বালিতে থুতনি রেখে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দশ মিনিট শুয়ে রইলাম। আস্তে আস্তে আমার শক্তি ফিরে আসছে। ছ'টা বেজে গেছে। সূর্যও বেশ উজ্জ্বল। রাস্তার ধারে নারকোল খোলাগুলোর মধ্যে কয়েকটা আস্তো নারকোল দেখতে পেলাম। হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকেই এগোলাম। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসলাম। আমার দু'হাঁটুর মাঝখানে একটা নারকোল চাপ দিতে লাগলাম। নরম কিন্তু ভাঙা যায় না। ওটার সবচেয়ে নরম জায়গাটা বার করার চেষ্টা করলাম। যেমন পাঁচদিন আগে মাছটাকে

নিয়ে করেছিলাম। প্রত্যেকবার নাড়ালেই বুঝতে পারছি ভেতরে দুধের মতন ছলছল আওয়াজ হচ্ছে। এই অদ্ভুত চাপা শব্দ আমার তেষ্টা বাড়িয়ে দিল। পেটে যন্ত্রণা হচ্ছিল হাঁটুর ঘায়ে রক্ত পড়ছে, আর আঙুলগুলোর মাথার ছাল উঠে ব্যথায় চিন্‌চিন্ করছে। নারকোলটা এদিক-ওদিক নাড়াচ্ছি, কোন্ দিক দিয়ে ভাঙবো সেটার চেষ্টা করছি, আর শুনতে পাচ্ছি ভেতরে স্বচ্ছ তাজা কিন্তু ছোঁয়া যাচ্ছে না দুধ ছলছল করছে। মনে হলো দশদিন সমুদ্রে যা হয়নি এই সকালে তাই হবে, আমি একবারে হিংস্র উন্মত্ত হয়ে যাব।

নারকোলের ওপরে ত্রিভুজ আকারের তিনটে চোখ আছে। খেতে গেলে প্রথমে ছুরি দিয়ে কেটে ভেতরে ঠুকতে হবে। কিন্তু আমার হাতে শুধু চাবি। যেটা দিয়েই বার বার শক্ত ছোবড়া কেটে ফেলার চেষ্টা করছি। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলাম। রাগে নারকোলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, তখনও শুনছি ভেতরে দুধের ছলছলানি।

সামনের রাস্তাটাই আমার শেষ আশা। আমার পায়ের সামনে ছড়ানো ভাঙা খোলাগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে এখানে কেউ এসেছিল নারকোল পাড়তে। রোজই সে আসে, গাছে ওঠে, নারকোল ভাঙে। নিশ্চয়ই পাশে কোনো জনবসতি আছে, না হলে কয়েকটা নারকোল জোগাড় করতে কেউ অনেক দূরে যায় না। এই সবই ভাবছি গাছে পিঠ দিয়ে, এমন সময় দূর থেকে একটা কুকুরের ডাক ভেসে এলো। আমার অনুভূতি এখন তীক্ষ্ণ। আমি একদম সতর্ক স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি রাস্তার ওপর দিয়ে একটা ধাতব আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

একটি কালো মেয়ে, অসম্ভব রোগা, অল্প বয়স, সাদা পোশাক পরা। হাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র ওপরটা আলগা, ওর হাঁটার সঙ্গে ওটা ঢং ঢং আওয়াজ করছে। আমি কোন্ দেশে এসেছি? মনে হচ্ছে যে কালো মেয়েটি, রাস্তা বরাবর আমার দিকেই আসছে, জামাইকার মেয়ে। আমি সানআনড্রেস আর প্রভিডেনসিয়া দ্বীপগুলোর কথা ভাবছিলাম। অ্যানিটিলসের সব দ্বীপগুলোর কথাই মনে হলো। এই মেয়েটিই আমার প্রথম সুযোগ, সম্ভবত শেষও। ও কি স্পেনের ভাষা বুঝবে। মেয়েটির মুখের দিকে দেখছিলাম, ও আমাকে দেখেনি।

অন্যমনে ধুলোমাখা চামড়ার চটি পরে পা টেনে টেনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। সুযোগ হাতছাড়ার ভয়ে আমি এতই বেপরোয়া যে, একটা অদ্ভুত ধারণা মনে এলো। আমি যদি স্পেনীয় ভাষা বলি, ও বুঝতে না পারে, তবে আমাকে রাস্তার পাশে ফেলে রেখেই চলে যাবে।

"ওহে, ওহে" উদ্বেগ নিয়ে আমি ইংরিজিতে বললাম। সে পাশ ফিরে চাইল। ওর বিশাল সাদা ভয়ার্ত চোখ দু'টো আমার দিকে তাকালো।

"আমি সাহায্য চাইছি" ! আমি বললাম। নিশ্চিত ও বুঝেছে।

সে এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত, আমার দিকে তাকালো, ভয়ে প্রায় মরে গিয়ে তীরের মতো ছুটে পালিয়ে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

একটা মানুষ, একটা গাধা আর একটা কুকুর

মনে হলো উদ্বেগেই মারা যাব। এক ঝলকে হঠাৎ দেখলাম যে আমি এখানেই মরে পড়ে আছি। শকুনিরা আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে। আবার কুকুরের ডাক শুনলাম। ডাকটা যত এগিয়ে আসছে আমার হৃৎপিণ্ড তত ধক্‌ধক্ করছে। হাতের তালুতে ভর করে ওঠার চেষ্টা করলাম। মাথা তুললাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক মিনিট। দুমিনিট। কুকুরের ডাক আরো কাছে। তারপর সব চুপচাপ। ঢেউ আছড়ে পড়ার আওয়াজ। নারকোল বনে হাওয়ার মাতামাতি। তারপর আমার জীবনের দীর্ঘতম মিনিটের শেষে একটা হাড়গিলে কুকুর এগিয়ে এলো, পেছনে একটা গাধা, দু'পাশে দুটো ঝুড়ি বইছে। পেছনে পেছনে হেঁটে আসছে একটা ফ্যাকাসে সাদা চামড়ার লোক, মাথায় খড়ের টুপি, হাঁটু পর্যন্ত প্যান্টটা মোড়া, পিঠে একটা বন্দুক ঝুলছে।

রাস্তাটা মোড় ঘুরেই সে আমাকে অবাক হয়ে দেখল। দাঁড়িয়ে পড়ল। কুকুরটা লেজ খাড়া করে এগিয়ে এসে আমাকে শুঁকতে লাগল। লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুকটা নামিয়ে বাঁটটা মাটিতে গুঁজে আমাকে দেখছে।

কেন জানি না মনে হচ্ছে আমি ক্যারিবিয়ানের কোথাও আছি। কিন্তু কলম্বিয়ায় নয়। আমাকে বুঝতে পারবে কিনা জানি না, তবু ঠিক করলাম স্পেনীয় ভাষাতেই ওর সঙ্গে কথা বলব।

"মশাই আমায় সাহায্য করুন"।

সে তখনই কোনো উত্তর দিল না। বিস্ময় নিয়ে আমায় দেখেই চলেছে, একদম চোখও বুজছে না। মাটিতে বন্দুকটা গোঁজা রয়েছে। বেশ ঠাণ্ডা মাথায় মনে হলো এখন আমার একটাই প্রাপ্য। লোকটা সোজা আমায় গুলি করুক। কুকুরটা আমার মুখ চাটছে, আমার সরে যাবারও ক্ষমতা নেই।

"আমাকে সাহায্য করুন" আমি মরিয়া হয়ে আবার বললাম। মনে হচ্ছে লোকটা আমার কথা বুঝতে পারছে না।

"তোমাদের কি হয়েছে?" বন্ধুত্বপূর্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করল।

যখন সে কথা বলল, আমার মনে হলো ক্ষিধে তেষ্টা, হতাশার থেকেও আমাকে যা তছনছ করেছে তা হলো কাউকে বলা যে আমার কি হয়েছে।

গলা বুজে আসছে, তবুও নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি বললাম — "আমি লুই অ্যালেজান্দ্রো ভেলাসকো। জাতীয় নৌবাহিনীর ডেস্ট্রোয়ার ক্যালডাসের একজন নাবিক। ২৮শে ফেব্রুয়ারি আমি সমুদ্রে পড়ে গেছিলাম।"

আমার ধারণা সারা পৃথিবী আমার এই কাহিনি জেনে গেছে। আমি যে-ই ওকে আমার নাম বলব, ও আমাকে সাহায্য করে কৃতার্থ হয়ে যাবে। কিন্তু সে একটুও নড়লো না। যেখানে ছিল সেখানেই আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুকুরটা আমার আহত হাঁটুটা চাটছে, সেটাকেও সামলালো না।

"তুমি কি মুরগীর নাবিক ?" — সে জিজ্ঞাসা করল। সম্ভবত ভেবেছিল তীর ধরে যে বাণিজ্যিক জাহাজগুলো শুয়োর আর মুরগী নিয়ে যায় তাদের কথা।

"না, আমি নৌ-বাহিনীর নাবিক।" তখনই লোকটা নড়লো। রাইফেলটা পিঠে নিয়ে মাথায় আবার টুপিটা পড়ল, আর বলল — "আমি বন্দরে কিছু তার নিয়ে যাচ্ছি, তারপরে তোমার জন্যে ফিরে আসব।" আমি ভাবলাম ও একটা ছুতো করে পালিয়ে যেতে চাইছে। "তুমি ঠিক ফিরে আসবে ?" আমি অনুনয়ের সুরে বললাম।

লোকটা বলল হ্যাঁ আসব। ফিরে আসব। নিশ্চিত। আমার দিকে চেয়ে সে দয়ালুর মতন হাসল। তারপর গাঁধার পেছন পেছন আবার হাঁটতে লাগল। কুকুরটা আমার পাশে, গন্ধ শুঁকে যাচ্ছে। যখন লোকটা একটু দূরে এগিয়ে গেছে, ঠিক আমার মাথায় এলো তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, চিৎকার করে বললাম — "এটা কোন্ দেশ ?"

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

১৩

ছ'শ লোক আমায় নিয়ে চলল সানজুয়ানে

সেই মুহূর্তে আমি যা আশাই করতে পারিনি, সাদামাটা ভাবে সে আমাকে একটাই উত্তর দিল, "কলম্বিয়া"।

সে যা কথা দিয়ে গেছিল, সেই মতই ফিরে এলো। আমার অপেক্ষা শুরু করার আগেই, চলে যাওয়ার একটুক্ষণ পরেই, ফিরে এলো। ঝুড়ি-বোঝাই গাধাটা আর অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র নিয়ে সেই কালো মেয়েটিকে (পরে জেনেছিলাম ওর বান্ধবী) সঙ্গে নিয়ে। কুকুরটা আমার পাশ ছাড়েনি। আমার মুখ আর গা চাটা বন্ধ করেছে, শোঁকাও থামিয়েছে। আমার পাশে শুয়েছিল আধ ঘুমে, গাধাটা এগিয়ে না আসা পর্যন্ত নড়েওনি। এখন লাফাতে লাগল আর লেজ নাড়তে লাগল। "তুমি হাঁটতে পারবে?" লোকটা জিজ্ঞাসা করলো। আমি বললাম, "দেখছি"। কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে টলে গেলাম।

আমি পড়ে যাওয়ার আগেই আমাকে ধরে ফেলে বলল — "তুমি পারবে না।"

সে আর মেয়েটা, আমাকে কোনরকমে গাধার পিঠে তুললো। আমার দুটো হাতেরই নীচটা ধরে রেখে জন্তুটাকে এগিয়ে নিয়ে চললো। চারপাশে লাফাতে লাফাতে কুকুরটা আগে ছুটলো।

রাস্তা ধরে টানা নারকোল গাছ। সমুদ্রে আমি তেষ্টা সহ্য করেছি, কিন্তু এখানে গাধার পিঠে, সরু আঁকা বাঁকা সারি সারি নারকোল গাছের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে, মনে হলো আর এক মুহূর্তও পারছি না। একটু নারকোলের দুধ চাইলাম। লোকটা বলল, "আমার কাছে ছুরি নেই।"

কথাটা ঠিক নয়। ওর বেল্টে একটা ছুরি ঝুলছিল। আমার যদি শক্তি থাকতো আমি তখনই জোর করে ওর কাছে থেকে ছুরিটা কেড়ে নিতাম। একটা নারকোল কেটে সবটা খেয়ে ফেলতাম।

পরে বুঝেছিলাম কেন আমাকে লোকটা নারকোল দুধ দেয়নি। আমায় সে প্রথম যেখানে দেখেছিল, তার থেকে দু'কিলোমিটার দূরে, সে প্রথমেই একটা বাড়িতে যায়। সেখানকার লোকেরাই তাকে পরামর্শ দেয়, যে একজন ডাক্তার পরীক্ষা করার আগে যেন আমায় কিছুই খেতে না দেয়। আর সবচেয়ে কাছের ডাক্তার হলো সান জুয়ান দে উরারাতে, এখান থেকে দু'দিন লাগবে যেতে।

আধ ঘন্টারও কম সময়ে আমরা সেই বাড়িটায় পৌঁছলাম। একদম পুরনো গড়ন, রাস্তার ধারে, কাঠ দিয়ে তৈরি, মাথায় টিনের ছাদ। তিনটি মানুষ আর দু'টি মহিলা আছেন। সবাই মিলে আমাকে গাধার থেকে নামালো, শোয়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে, একটা কাপড়ের খাটিয়ায় শুইয়ে দিল। একজন মহিলা রান্না ঘর থেকে দারুচিনির গন্ধভরা ফুটন্ত জল নিয়ে এলো। বিছানার পাশে বসে চামচে করে খাওয়াতে লাগল। লোভির মতো কয়েক ফোঁটা খেলাম। একটু পরে মনে হচ্ছে আমার শক্তি ফিরে আসছে। আর খেতে চাই না। শুধু ওদের বলতে চাই, কি হয়েছিল আমার।

কেউই দুর্ঘটনার কথা জানে না। আমি ব্যাখ্যা করতে লাগলাম সমস্ত ঘটনাটা। যাতে ওরা বুঝতে পারে আমি কেমনভাবে রক্ষা পেয়েছি। আমার ধারণা ছিল, আমি পৃথিবীর যেখানেই পৌঁছই, সকলেই ইতিমধ্যেই জেনে গেছে সেই মারাত্মক পরিণতি। মহিলাটি যখন আমাকে অসুস্থ বাচ্চা ছেলের মতন চামচে করে দারুচিনির জল খাওয়াচ্ছিল, তখন আমার বিভ্রান্তি কেটে যাচ্ছিল, বুঝতে পারছি যে আমি ভুল ধারণা নিয়ে বসেছিলাম।

আমি ওদের বার বার বলার চেষ্টা করছি, আমার কি হয়েছিল। পুরুষ আর মহিলারা নিরুত্তাপ চোখে খাটের পায়ের কাছে বসে আমায় শুধু দেখে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। দশ দিন ধরে সমুদ্রে হাঙরদের হাত থেকে, আরো সব বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে, আমি যদি ভয়ঙ্কর খুশিতে না থাকতাম, এই লোকগুলোকেই মনে হতো অন্য কোনো নক্ষত্র থেকে এসেছে।

গল্পটাকে বিশ্বাস করা

যে দয়াশীল মহিলাটি আমায় জল খাইয়ে যাচ্ছে, আমাকে তার কাজে বাধা দিতে দিচ্ছে না। যতবার আমি আমার গল্প বলতে যাচ্ছি সে বলছে — "এখন চুপ করো। পরে আমাদের বলতে পারবে।"

আমি যা হয় একটা কিছু খেতে পারতাম। রান্না ঘর থেকে দুপুরের রান্নার সুন্দর গন্ধ আসছে। কিন্তু আমার সব অনুরোধই ব্যর্থ।

ওরা বলল — ডাক্তার এলো না। দশ মিনিট অন্তর চামচে করে আমাকে চিনির জল খাওয়াচ্ছে। অল্পবয়সী মহিলাটি, একটি মেয়ে, আমার ঘাঁটা কাপড় আর গরম জল দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল। আস্তে আস্তে সারা দিনটা চলে গেল। ক্রমশ আমার ভালো লাগছে। আমি নিশ্চিত, বন্ধুর মতন মানুষজনের যত্নেই আছি। যদি ওরা চামচে করে চিনির জল না খাইয়ে খাবার খেতে দিত, আমার শরীর সেই ধাক্কা সহ্য করতে পারতো না।

যে লোকটির সঙ্গে আমার রাস্তায় সাক্ষাৎ হয়েছিল তার নাম দামাসো ইমিতেলা। ১০ই মার্চের সকাল দশটায়, সেদিন আমি পাড়ে এসে পৌঁছেছিলাম, সে কাছেই মুলাটোসে স্টেশন-বাড়িতে গিয়ে, যেখানে আমাকে তুলেছিল সেই বাড়িতে কয়েকজন

পুলিস নিয়ে এলো। তারাও সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ঘটনাটা জানে না। মুলাটোসে কেউই খবরটা জানে না। সেখানে খবরের কাগজও পৌঁছয় না। ছোট্ট একটা দোকানে একটা ইলেকট্রিক মোটর লাগানো আছে, একটা রেফ্রিজারেটর আর একটা রেডিও আছে, কিন্তু তারা কেউ খবর শোনে না। পরে জেনেছিলাম যখন দামাসো ইমিতেলা পুলিস ইন্সপেক্টারকে বলেছিল, যে সে আমাকে সমুদ্রের পাড়ে বিধ্বস্ত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছে, আর আমি তাকে বলেছি যে আমি ডেস্ট্রয়ার ক্যালডাসে ছিলাম, তখন তারা মোটর চালিয়ে সারাদিন ধরে কারটাগেনার সংবাদ প্রচার শুনতে লাগল। কিন্তু তখন আর দুর্ঘটনার কোনো খবর নেই। শুধু যে সন্ধ্যায় ঘটনাটা ঘটেছিল তারই একটা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছিল।

পুলিস ইন্সপেক্টর, তার যত পুলিস ছিল সব, আর মুলাটোসের প্রায় ষাট জন লোক জড়ো হলো আমাকে সাহায্য করতে। দুপুরের একটু পরে ওরা বাড়িতে চলে এলো। ওদের কথাবার্তার জন্য গত বারো দিনের মধ্যে একবারই আমার গভীর ঘুমটাই ভেঙে গেল।

ভোরের আগেই বাড়িটা ভর্তি হয়ে গেল মানুষে মানুষে। মুলাটোসের যত মানুষ, নারী-পুরুষ বাচ্চারা শুধু আমায় একবার দেখতে এসেছে। আমার এই প্রথম পরিচয় ঘটল কৌতূহলী মানুষের ভিড়ের সঙ্গে। পরবর্তী দিনগুলোতে সব জায়গায় সেই ভিড় আমার পেছনে পেছনে লেগেই রইল। লোকগুলো লণ্ঠন আর মশাল বাতি নিয়ে এসেছিল। যখন পুলিস ইন্সপেক্টর তার প্রায় সব সহকর্মীদের নিয়ে আমাকে বিছানা থেকে তুললো, মনে হচ্ছিল আমার সূর্য-পোড়া চামড়া ওরা ছাড়িয়ে নিচ্ছে। একেবারে কুৎসিত কাণ্ড!

দারুণ গরম। আমার রক্ষা-কর্তা জনতার মুখগুলো আমার দমবন্ধ করে দিচ্ছে। রাস্তায় নেমে যখন হাঁটা শুরু হলো, অজস্র লণ্ঠন আর আলোর ঝলকানি আমার মুখের ওপর পড়ছে। অন্ধ হয়ে যাচ্ছি জনতার গুঞ্জন আর পুলিস ইন্সপেক্টরের সোচ্চার নির্দেশে। বুঝতে পারছি না কখন একটা গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছবো। যেদিন ডেস্ট্রয়ার থেকে পড়ে গেছিলাম, তারপর থেকে আর কিছুই করিনি, শুধু অজানা পথেই চলেছি। সেই সকালেও কোথায় চলেছি জানি না। বুঝতে পারছি না। এই মরমী বন্ধু জনতা আমায় নিয়ে কি করতে চলেছে।

ফকিরের গল্প

যেখানে আমাকে ওরা খুঁজে পেয়েছিল, সেখান থেকে মুলাটোসের রাস্তা দীর্ঘ আর কষ্টকর। দু'পাশে দু'টো খুঁটি লাগিয়ে একটা নরম খাটিয়ায় আমাকে তুলল। দু'টো লোক দু'পাশে খুঁটি দুটো ধরে, আমাকে নিয়ে চলল লণ্ঠনের আলোভরা সরু আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে। আমরা খোলা হাওয়ায় চলেছি, কিন্তু লণ্ঠনের জন্য মনে হচ্ছে বন্ধ ঘরের মতন গরম।

আটজন লোক, আধ ঘন্টা অন্তর, পালা করে আমায় নিয়ে চলেছে। আমাকে একটু জল কয়েক টুকরো সোডা বিস্কুটও দিয়েছে। আমি জানতে চাইলাম কোথায় চলেছি, আমাকে নিয়ে ওরা কি করতে চাইছে। সব কিছুই বলছে, শুধু ঐটা ছাড়া। সবাই কথা বলছে শুধু আমি ছাড়া। জনতাকে নিয়ে চলেছে যে ইন্সপেক্টর, কাউকে আমার কাছে ঘেঁষতেই দিচ্ছে না। যাতে আমার সঙ্গে কথা বলতে না পারে। আমি দূর থেকে শুনছি চিৎকার, নির্দেশ, আর কথাবার্তা। যখন মুলাটোসের প্রধান রাস্তায় এসে পৌছলাম, পুলিস তখন আর জনতাকে সামলাতে পারছে না। তখন সকাল আটটা।

মুলাটোস মাছ ধরার একটা ছোট গ্রাম। কোনো টেলিগ্রাফ অফিস নেই। সবচেয়ে কাছের শহর **সান জুয়ান ডে উরারা। মন্টেরিয়া** থেকে সেখানে সপ্তাহে দু'বার একটা ছোট প্লেন নামে। যখন ছোট গ্রামটায় পৌছলাম, মনে হলো কোথাও বেশ একটা এসেছি। বাড়ির লোকেদের খবর পাব। কিন্তু মুলাটোস আমার যাত্রাপথের বড় জোর মাঝামাঝি জায়গা।

সেখানে আমাকে একটা বাড়িতে তোলা হলো। সারা শহর সারিবদ্ধ হয়ে আমাকে শুধুই একবার দেখতে আসছে। আমার মনে পড়ে গেল বোগোটাতে দু'বছর আগে **পঞ্চাশ সেন্টাভো** দিয়ে একজন ফকিরকে দেখেছিলাম। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ঘন্টার পর ঘন্টা, শুধু তাকে একবার দেখবার জন্য। আধ ঘন্টা অন্তর দু'ফুট এগোতে পারবে। ঘরে ঢোকার পরে ফকিরকে দেখা গেছিল একটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে। কাউকেই তখন আর দেখতে ইচ্ছে করবে না। মনে হবে এখনই বেরিয়ে যাই। পা ছড়িয়ে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিই।

আমার সঙ্গে ফকিরের পার্থক্য একটাই। সে ছিল কাঁচের বাক্সের মধ্যে। সে ন'দিন খায়নি। আর আমি দশদিন, সমুদ্রে আর একদিন মুলাটোসের ঘরের বিছানায়। আমি দেখছি আমার সামনে দিয়ে কত মুখ কুচকাওয়াজ করে চলেছে। কালো মুখ, সাদা মুখ — সারি সারি, শেষ নেই। দারুণ গরম। আমার মধ্যে একটা যথার্থ সাড়া জাগালো —সব ব্যাপারটা মিলিয়ে একটা দারুণ কৌতুক। মনে হলো ডুবে যাওয়া জাহাজের নাবিককে দেখাবার জন্য কেউ হয়ত টিকিটও বিক্রি করছে।

যে নরম খাটিয়ায় আমাকে মুলাটোসে নিয়ে এসেছে, সেটাতে করেই আমাকে সানজুয়ান ডে উরারা'য় নিয়ে চলল। সঙ্গে চলল আরও বড়ো জনতা, দুশ লোকের কম নয়। মহিলারাও আছে, ছোট ছেলেমেয়ে আর পশুপাখিও। কেউ কেউ গাধার পিঠে। আর আর বেশিরভাগ হাঁটতে হাঁটতে। সারাদিন গেল এই যাত্রায়, ঐ জনতার টানে চলতে চলতে, ছ'শ লোকের পথের মাঝে এই বাঁক নেওয়া, বুঝলাম আমার শক্তি ফিরে আসছে। বুঝতে পারলাম মুলাটোস জনহীন হয়ে গেছে। অনেক সকাল থেকে মোটর চালিয়ে রেডিও গ্রামটাকে ভরে দিয়েছে বাজনার সুরে। উৎসবের মতন ব্যাপার। এসবের মাঝখানে, এই উৎসবের প্রধান কারণ আমি, শুয়ে আছি বিছানায়। সারা গ্রাম ভেঙে পড়েছে আমায় দেখতে। সেই জনতা আমাকে একা বিদায় দিতে

পারে না। আমার সঙ্গে সানজুয়ান ডে উরারা'য়। লম্বা সারি যাত্রির দল, চওড়া পাক খাওয়া রাস্তা জুড়ে। সারা যাত্রা পথেই আমি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। কয়েক টুকরো সোডা বিস্কুট আর কয়েক চুমুক জল আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ক্ষুধা, তৃষ্ণাও বাড়িয়ে দিয়েছে। সান জুয়ানে এসে আমার এক গ্রামের ভোজ সভার কথা মনে পড়ল। সমুদ্রের হাওয়ায় ঝাপটা খাওয়া সেই সুন্দর ছবির মতন শহরের সমস্ত মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এলো আমায় দেখবার জন্য। এই শহরের কৌতূহলী জনতার বিরুদ্ধে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একে অন্যকে গুঁতো দিয়ে সরিয়ে দিয়ে, রাস্তায় আমাকে দেখতে বেরিয়ে আসা, জনতাকে পুলিস নিয়ন্ত্রণ করছে।

আমার যাত্রার শেষ। ডাক্তার হাসবার্টো গোমেজ, তিনিই প্রথম চিকিৎসক আমাকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন। তিনিই আমাকে সেই দারুণ খবরটা দিলেন। কিন্তু আমাকে পরীক্ষা করার আগে কিছুই বলেননি, নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যে আমি সহ্য করতে পারব কিনা। আমার গালে আল্‌তো হাত বুলিয়ে আর বন্ধুর মতো হেসে বললেন — "একটা প্লেন তোমাকে কারটাগেনায় নিয়ে যাবার জন্য তৈরি। আমার বাড়ির লোকজন সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

scanned By

Arka-The JOKER

boirboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

১৪

আমার বীরত্ব হলো নিজেকে মরতে না দেওয়া

আমি কখনো ভাবিনি, যে একজন মানুষ ক্ষুধা, তৃষ্ণা উপেক্ষা করে দশদিন বোটে থাকলে বীর বনে যেতে পারে। আমার অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। যদি বোটে সব সরঞ্জাম থাকত — তাজা বিস্কুট, কম্পাস, মাছ ধরার যন্ত্র আমি এখন যেমন আছি তেমনই থাকতে পারতাম। কিন্তু একটাই পার্থক্য হতো, আমি বীরের মতন ব্যবহার পেতাম না। তাই আমার ক্ষেত্রে বীরত্ব হলো দশদিন ধরে খিদে তৃষ্ণায় নিজেকে মরতে না দেওয়ার নিছক যোগফল।

আমি বীরের মতো কিছু করিনি। আমার চেষ্টা ছিল শুধু নিজেকে বাঁচানোর। কিন্তু এই উদ্ধার পাওয়াই একটা রঙীন মোড়ক পেল। উপহার পেলাম বীরের আখ্যা। একটা মিঠাইয়ের মতো ভেতরে বিস্ময়। আমার কোনো উপায় রইল না, যেভাবে এই উদ্ধার পেলাম, বীরত্ব আর সব কিছু সেইভাবে মেনে নেওয়া ছাড়া।

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে নিজেকে বীর হিসাবে কি রকম লাগছে। আমি বুঝতে পারিনি কি উত্তর দেব। আসলে আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি যা ছিলাম তাই-ই আছি। বাইরে-ভেতরে কিছুই পাল্টাইনি। সূর্যের তাপে মারাত্মক পোড়াগুলোর জ্বালানি বন্ধ হয়েছে। হাঁটুর ঘা'টা এখন শুধু একটা চামড়ার দাগ। আমি আবার লুই অ্যালজানদ্রো ভেলাসকো — এই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

আসলে অন্য লোকেরাই পাল্টে গেছে। আমার বন্ধুরা আরো বেশি বন্ধু হয়ে গেছে। শত্রুরা বোধহয় আরো বেশি শত্রু হয়েছে, যদিও সত্যি আমার সে রকম কেউ নেই। রাস্তায় লোকে যখন আমায় চিনতে পারে, অদ্ভুত কোনো জন্তু দেখার মতন তাকায়। এর জন্যই আমি সাধারণ লোকের মতো জামা-প্যান্ট পরি, আর এই পরেই চালাতে হবে, যতদিন না লোকে ভুলে যায়, খাবার না খেয়ে, জল না খেয়ে দশদিন ধরে এই আমি বোটে কাটিয়েছি।

কোনো গুরুত্বপূর্ণ লোক হয়ে গেলে প্রথমেই যা হয়, দিন-রাত, যে পরিস্থিতিতেই হোক, লোকে চায় আমি নিজের সম্পর্কে কথা বলে যাই। কারটাগেনার নৌ-হাসপাতালে এসে সেটা বুঝতে পারলাম। সেখানে তারা একটা রক্ষী দিয়ে দিয়েছিল যাতে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে না পারে। তিনদিন পরে আমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলাম। কিন্তু হাসপাতাল ছাড়তে পারলাম না। ছাড়া পেলেই সারা পৃথিবীকে আমার কাহিনী বলতে হবে। রক্ষীরা আমায় বলেছে সমস্ত দেশ থেকে সাংবাদিকরা চলে এসেছে সেই শহরে। আমার সাক্ষাৎকার আর ছবি নিতে। এর মধ্যে একজন,

প্রায় কুড়ি সেন্টিমিটার লম্বা, দারুণ গোঁফ, আমার পঞ্চাশটার বেশি ফটো নিল। কিন্তু আমার রোমাঞ্চকর ঘটনা সম্পর্কে, আমাকে কোনো প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হলো না।

তার একজন, আরো দুঃসাহসী, ডাক্তারের ছদ্মবেশে রক্ষীদের বোকা বানিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। এটা তার কাছে এক বিরাট ক্ষমতা, কিন্তু স্বল্পস্থায়ী।

www.boiRboi.blogspot.com

একটি সংবাদের গল্প

শুধু আমার বাবা, রক্ষীরা, ডাক্তার এবং নার্সরা নৌ-হাসপাতালে আমার ঘরে ঢোকার অনুমতি পেয়েছিল। একদিন একজন ডাক্তার এলেন, আগে কোনোদিন দেখিনি। বেশ তরুণ, একটু লম্বা ঝোলা শার্ট, চোখে চশমা, আর গলায় ঝুলছে একটা ফোনেনন্ডোস্কোপ। কিছু না বলেই তিনি উঠে গেলেন।

রক্ষীদের করপোরাল তার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে পরিচয় জানতে চাইল। তরুণ ডাক্তারটি পকেট খুঁজতে লাগলেন, একটু ইতস্তত করলেন, বললেন, তার কাগজপত্র আনতে ভুলে গেছেন। রক্ষীটি তাকে জানিয়ে দিল হাসপাতালে ডাইরেক্টরের বিশেষ অনুমতি ছাড়া আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। ওরা ডাইরেক্টরের খোঁজে চলে গেল। কুড়ি মিনিট পরে সবাই ঘরে ফিরে এলো।

রক্ষীটি প্রথমে ঢুকে আমায় বলল যে ওনাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে পনের মিনিটের জন্য আমাকে পরীক্ষা করতে। তিনি বোগোতার একজন মানসিক চিকিৎসক। যদিও রক্ষীটি ভাবছিল, সে একজন ছদ্মবেশী সাংবাদিক।

"তুমি ওরকম ভাবছ কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "কারণ ও ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে, আর মানসিক চিকিৎসকরা ফোনেনন্ডোস্কোপ ব্যবহার করে না।"

যাই হোক তিনি হাসপাতালের ডাইরেক্টরের সঙ্গে পনেরো মিনিট কথাবার্তা বলেছেন, জটিল চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় ওষুধ আর মনস্তত্ত্ব নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন, আর তাঁরা তাড়াতাড়ি একমতও হয়েছেন।

জানি না, রক্ষীটি আমায় সতর্ক করেছিল বলেই কিনা, যখন তরুণ ডাক্তারটি আমার ঘরে ফিরে এল, তাঁকে আর ডাক্তার মনে হচ্ছিল না। তাঁকে সাংবাদিকও মনে হচ্ছিল না। যদিও আমি সেই মুহূর্ত পর্যন্ত একজন সাংবাদিককেও কোনোদিন দেখিনি। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল ডাক্তারের ছদ্মবেশে একজন পুরোহিত। কিভাবে শুরু করবেন বুঝতে পারছিলেন না। আসলে চেষ্টা করছিলেন রক্ষীটাকে কিভাবে দূরে রাখা যায়।

তিনি রক্ষীটিকে বললেন — "আমাকে একটু কাগজ জোগাড় করে দিয়ে উপকার করবে?"

সম্ভবত ভেবেছিলেন, রক্ষীটি কাগজ আনতে অফিসে চলে যাবে। কিন্তু রক্ষীদের নির্দেশ ছিল আমাকে একা ফেলে যাওয়া যাবে না। সে খুঁজতে চলে না

গিয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "লেখার কাগজ নিয়ে এসো তো, জলদি।"

পরের মুহূর্তেই কাগজ চলে এল। প্রায় পাঁচ মিনিটের ওপরে বসে আছি, কিন্তু ডাক্তার আমাকে একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেননি। কাগজ না আসা পর্যন্ত পরীক্ষাও শুরু করেননি। তিনি কাগজটা আমার হাতে দিয়ে একটা জাহাজের ছবি আঁকতে বললেন। আমি আঁকলাম। সেই ছবিটাতে সই করতে বললেন। তাও করলাম। তারপর তিনি একটা খামার বাড়ি আঁকতে বললেন। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব তাই আঁকলাম, পাশে একটা কলাগাছও এঁকে দিলাম। তিনি সেটাতেও সই করতে বললেন। তখনই আমি নিশ্চিত হলাম যে উনি একজন ছদ্মবেশী সাংবাদিক। কিন্তু তিনি বার বার বলে চললেন যে তিনি ডাক্তার-ই।

আমার ছবি আঁকা হয়ে গেলে তিনি কাগজগুলো দেখলেন। বিড়বিড় করে কি বললেন। তারপর আমার দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু রক্ষীটি আটকাল। তাকে মনে করিয়ে দিল এই ধরনের প্রশ্ন করার অনুমতি নেই। তখন উনি আমার শরীর পরীক্ষা করলেন। যেভাবে ডাক্তাররা করে। ওনার হাত দু'টো বরফের মতন ঠাণ্ডা। রক্ষীরা যদি তার ছোঁয়া পেত তাহলেই তাকে ঘর থেকে বার করে দিত। কিন্তু আমি কিছু বললাম না। কারণ তার এই ঘাবড়ে যাওয়া, আর তিনি যে একজন রিপোর্টার, এই সম্ভাবনা আমার সমবেদনা জাগিয়ে তুলল। তার পনেরো মিনিট সময়ের আগেই, তিনি আঁকা ছবিগুলো নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন আকাশ ভেঙে পড়ল। এল টিমপো পত্রিকায় প্রথম পাতায় ছবিগুলো ছেপে বেরোল। পুরো নামকরণ আর তীর এঁকে "এইখান থেকেই আমি জলে পড়ে গিয়েছিলাম" এরকম একটা পরিচিতি। আর একটা তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হলো জাহাজের ব্রীজের দিকে। সেটা ভুল হয়েছিল। কারণ আমি ছিলাম স্টার্নের দিকে, ব্রীজের দিকে নয়। কিন্তু ছবিগুলো আমারই আঁকা।

কেউ কেউ আমাকে বলল, আমি ওদের ভুল সংশোধন করতে বলি। সেটা আমি দাবিও করতে পারতাম। কিন্তু আমার সেটা অবাস্তব মনে হলো। সাংবাদিকটিকে আমার বেশ শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করছিল। সামরিক বাহিনীর হাসপাতালে ঢোকার জন্য যিনি ছদ্মবেশ নিতে পারেন। যদি কোনোভাবে বলতে পারতেন যে তিনি একজন সাংবাদিক, আমি রক্ষীটিকে ঠিক দূর করার ব্যবস্থা জানতাম। কারণ প্রকৃতপক্ষে সেইদিনই আমার গল্প অন্যকে বলার অনুমতি আগেই পেয়ে গেছিলাম।

গল্পের অর্থমূল্য

ছদ্মবেশী সাংবাদিকটির দুঃসাহসিক অভিযানের পর আমার স্পষ্ট ধারণা হলো, আমার দশ দিনের সমুদ্রের গল্প সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলোর কি ভীষণ আগ্রহ। প্রত্যেকেই আগ্রহী। আমার নিজের বন্ধুরাও বারবার গল্প বলতে বলছে। যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে

বোগোটায় পৌঁছলাম, বুঝলাম আমার জীবন পাল্টে গেছে। বিমান বন্দরে প্রচুর জাঁকজমক করে আমাকে অভিনন্দন জানানো হলো। দেশের রাষ্ট্রপতি অভিনন্দিত করলেন আমার বীরোচিত কৃতিত্বের জন্য। সেইদিন থেকেই আমি জানতাম নৌ-বাহিনীতেই থেকে যাব। অবশ্য এখন থেকে ক্যাডেটের পদমর্যাদা নিয়ে।

এর সঙ্গে আর যা ঘটলো আমি আগে ভাবতেও পারিনি। বিজ্ঞাপন আর প্রচার সংস্থাগুলো থেকে নানা সাধু প্রস্তাব আসতে লাগল। আমার ঘড়ির জন্য আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। সমুদ্র যাত্রার দিনগুলিতে পাক্কা সময় দিয়েছে। কিন্তু ভাবিনি এটাই ঘড়ির প্রস্তুতকারকের কাছে বিশেষ আগ্রহের বিষয় হবে। ওরা আমাকে পাঁচশ পেসো, আর একটা নতুন ঘড়ি দিল। একটা বিশেষ মার্কা মারা চুইংগাম খেয়েছিলাম বলে, বিজ্ঞাপন দিয়ে এক হাজার পেসো পেলাম। আমি ভাগ্যবান, যে আমার জুতোটার প্রস্তুতকারকদের বিজ্ঞাপনের অনুমোদন করাতে ছ হাজার পেসো দিল। আমার গল্প রেডিওতে বলা হলো বলে পেলাম পাঁচ হাজার পেসো। কখনো কল্পনাই করতে পারিনি যে দশ দিনের ক্ষুধা আর তৃষ্ণা সহ্য করার ব্যাপারটা এত লাভজনক হয়ে উঠতে পারে। সত্যিই তাই। এখন পর্যন্ত আমি দশ হাজার পেসো পেয়েছি। অবশ্য দশ লক্ষ পেলেও আমি ঐ মারাত্মক অভিযানে আর যাব না।

আমার বীরের জীবনযাত্রা আহা মরি কিছু না। সকাল দশটায় উঠি। কাফেতে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করি, বা কোনো বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে কথা বলি, যারা আমার অভিযান নিয়ে কাজ করছে। প্রায় রোজই সিনেমা দেখি। কখনোই নিরাপদ থাকি না। কিন্তু সঙ্গীদের নাম বলতে পারব না। সেটা গল্পের বাকি অংশ।

প্রতিদিন সব জায়গা থেকে চিঠি আসে। এমন লোকেদের চিঠি যাদের, আমি জানিও না। পেরেইরা থেকে একটা চিঠি এল। তলায় আদ্যক্ষর জে ভি সি, একটা দীর্ঘ কবিতা পেলাম লাইফ বোট আর শঙ্খচিল নিয়ে। মেরী এড্রেস — নিয়মিত আমাকে চিঠি লিখছে। আমার আত্মার শান্তির জন্য যে প্রার্থনা করেছিল, যখন আমি ক্যারিবিয়ানে ভাসছি। আমাকে একটা ছবি পাঠিয়েছে সে, যার ভেতরে লেখা, সংবাদপত্রের পাঠকরা যেটা দেখেছে।

আমার গল্প, রেডিও আর টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে বলেছি। আমার বন্ধুদেরও বলেছি। বিরাট একটা ফোটো এলবাম নিয়ে একজন বয়স্কা বিধবাকেও বলেছি তিনি আমাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। কেউ কেউ আমাকে বলেছে এই গল্পটা হচ্ছে অলীক কল্পনা। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছি, যদি তাই হয়, তবে সমুদ্রে দশ দিন ধরে আমি করছিলাম কি ?

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং 627
তারিখ 6.11.2006
ফোন 2507317 ৭৬
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি

Downloaded From

www.boiRboi.blogspot.com

/http://boirboi.blogspot.com

This Book Is Scanned By

ARKA- THE JOKER